রাজ-প্রেয়সী রাজবধূ

শ্যামলী বসু

জে. এস. প্রকাশনী
৩এ, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

RAJPREYASHI RAJBADHU
A historical novel.
By : Shyamali Basu
Publishers : J. S. Prakasani
3A, Mahendra Srimani Street
Calcutta-700 009

প্রথম প্রকাশ—২রা আশ্বিন, ১৩৭০

পরিবেশক :
জ্যোতি প্রকাশনী
এ ১৮, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭
সুবর্ণরেখা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বাঁধাই :
ইস্টেণ্ড ট্রেডার্স
২০, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্য প্রাপ্তিস্থান—কথা ও কাহিনী
এবং বইপাড়ার অন্যান্য দোকান।

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীপ্রভাত কুমার কর্মকার

প্রকাশক :
মীরা ঘোষ
জে. এস প্রকাশনী
৩এ, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
শ্রীশিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

উৎসর্গ

আমার স্বামীর স্মৃতিতে

রাজ-প্রেয়সী রাজবধূ

॥ এক ॥

সূর্য অস্ত গেছে।

পশ্চিম আকাশের গায়ে সামান্য রক্তবর্ণছটার আভাস।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়।

গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদী-সঙ্গমে পুণ্যতীর্থ প্রয়াগক্ষেত্র ।

লোকালয় ছাড়িয়ে নগরের নির্জন প্রান্তে ভাগীরথীর তীরে দাঁড়িয়েছিলেন এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ দূর পশ্চিম আকাশে। ভ্রূ সামান্য কুঞ্চিত। মসৃণ ললাটে চিন্তার জটিল রেখা।

দীর্ঘদেহী পুরুষের বয়স বেশি নয়। মুখশ্রী দেখলেই বোঝা যায় তিনি তরুণ বয়সী। সুগঠিত দেহ। গাত্রবর্ণ সুগৌর। অতি রূপবান। পুরুষ—অতি উচ্চ বংশীয় তাতে সন্দেহ নেই।

তাঁর পরনে মূল্যবান পোষাক। গলায় বহুমূল্য রত্নহার। কানে রত্নকুণ্ডল, বাহুতে মণিময় অঙ্গদ, হাতে মণিময় কেয়ূর, মাথার উষ্ণীষে মহার্ঘ হীরা। সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা অন্ধকারেও হীরার দ্যুতির ঔজ্জ্বল্য বোঝা যায়। কটিবন্ধে তরবারি। তরবারির হাতলটিও রত্নখচিত।

একটি সুসজ্জিত অশ্ব বাঁধা রয়েছে অদূরে একটি বৃক্ষের সঙ্গে। তৃণাদি খেয়ে বিচরণ করছে অশ্বটি। মাঝে মাঝে মাটিতে পা ঠুকে প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

পাথরের মূর্তির মতোই স্থির হয়ে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন অভিজাত পুরুষ। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। কোন দিকে তাঁর দৃক্‌পাত নেই।

এমন সময় দূরে দেখা দিলো একদল অশ্বারোহী সেনা। তাদের দলনায়ক এক যুবা। তাঁরও বয়স বেশি নয়। সুগঠিত দেহী তিনি, গাত্রবর্ণ তাম্রাভগৌর। চোখের দৃষ্টি চঞ্চল, কিন্তু তীক্ষ্ণ ।

ইতস্ততঃ দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে সেনারা এগিয়ে আসছিল নদীর দিকে।

এমন সময় দলপতির দৃষ্টি পড়লো গাছের সঙ্গে বাঁধা সুসজ্জিত অশ্বটির দিকে। তিনি ইঙ্গিতে সৈনিকদের থামতে আদেশ দিলেন। তারপর নিজে অশ্ব থেকে অবতরণ করে এগিয়ে চললেন নদীর দিকে।

কিছুটা অগ্রসর হয়ে তাঁর দৃষ্টি পড়লো নদীতীরে দণ্ডায়মান পুরুষ-মূর্তির দিকে। তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি নিঃশব্দে এসে দণ্ডায়মান পুরুষের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। সসম্ভ্রমে ডাক দিলেন, 'মহারাজ।'

এতক্ষণে চমক ভাঙলো যুবাপুরুষের।

তিনি পিছন দিকে না ফিরে বললেন 'কে'? পরক্ষণেই ঘুরে আগত সেনানীকে দেখে স্নিগ্ধ হাসিতে কমনীয় হয়ে উঠলো তাঁর সুগৌর মুখ। 'ও, সেনাপতি দেবশর্মা।' এই বলে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

তরুণ সেনাপতি যুক্তকরে অভিবাদন জানালেন তাঁর প্রভুকে। 'মহারাজ!' শিবির থেকে দীর্ঘ সময় আপনি অনুপস্থিত। তাই দেখে আমরা বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম।'

বিষণ্ণ হাসির রেখা ফুটলো দণ্ডায়মান পুরুষের ওষ্ঠপ্রান্তে।

স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তিনি তাকালেন সেনাপতি দেবশর্মার দিকে। সে দৃষ্টি স্নেহ এবং বন্ধুপ্রীতিতে প্রগাঢ়।

'দেবশর্মা, তুমিতো শুধুমাত্র আমার অনুগত সেনানায়ক নও। তুমি আমার প্রিয় বাল্যবন্ধু। তোমার স্বর্গত পিতা মিত্রশর্মা আমার স্বর্গত পিতার আর পিতৃব্যের মন্ত্রী ছিলেন', বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর ভারী হয়ে আসে।

'দেবশর্মা, আমরা শৈশবে এক সঙ্গে খেলা করেছি। যৌবনে একই সঙ্গে অসি চালনা শিক্ষা করেছি। ধনুর্বিদ্যা শিখেছি একই গুরুর কাছে।'

কথা বলতে বলতে পুরুষ এগিয়ে এলেন। দেবশর্মার কাঁধে একটি

হাত রেখে গাঢ় স্বরে বলে উঠলেন, 'কি ভাবছিলে বন্ধু? কাশ্মীররাজ জজ্জের গুপ্তঘাতকের হাতে আমি—'।

'না, না, মহারাজ।' সেনাপতি দেবশর্মা আহত অধৈর্য স্বরে বলে উঠলেন। 'কাশ্মীরের অধিপতি মহারাজা বিনয়াদিত্য জয়াপীড়। জজ্জ নয়। জজ্জ—বিশ্বাসঘাতক, মিত্রহন্তা, কৃতঘ্ন।' প্রবল ঘৃণা ফুটে উঠলো দেবশর্মার কথার মধ্যে। কথা শেষ করে আবার যুক্তকরে মহারাজাকে অভিবাদন জানিয়ে দেবশর্মা বলে ওঠেন, 'কাশ্মীরের অধিপতি আপনি। মহারাজা জয়াপীড়। কাশ্মীর থেকে অনেক দূরে প্রয়াগতীর্থে এসেছি আমরা। কাশ্মীরের রাজভক্ত সেনানীরা। আমরা জানি, আমরা যেখানেই থাকি—আমাদের রাজা—মহারাজা বিনয়াদিত্য জয়াপীড়।'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন দেবশর্মা। মাথা তুলে গ্রীবা উন্নত করে গর্বিত স্বরে আবার বলে উঠলেন, 'আমাদের রাজা বিনয়াদিত্য জয়াপীড।'

মহারাজ জয়াপীড়ের দৃষ্টিতেও গর্ব। তাঁর গর্ব মুষ্টিমেয় কিন্তু একান্ত অনুগত এই সেনাদের জন্য।

উত্তেজনায় দেবশর্মার গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি ঘৃণাভরে বলে উঠলেন, 'জজ্জ বিশ্বাসঘাতক! কৃতঘ্ন! আমরা কবে তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবো, শাস্তি দিতে পারবো, তারই প্রতীক্ষায় আছি। কবে আসবে সেই শুভলগ্ন।'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

তবু চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেলো না। কারণ, শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। নদীর জলেও চাঁদের আলো পড়েছে। লক্ষ হীরক-চূর্ণের মতো চাঁদের আলো নাচছে নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে।

সেইদিকে তাকিয়ে জয়াপীড় বলে উঠলেন, 'দেবশর্মা! তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি গোপন কথা আছে। কিন্তু আমি যেন কারো প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারছি না। রাজশিবিরে বসেও এসব কথা

আলোচনা করতে চাই না আমি।' কি ভেবে নীরব হয়ে গেলেন, জয়াপীড়।

কোন প্রশ্ন না করে নীরব হয়ে রইলেন দেবশর্মা। তিনি ভালো করেই বুঝছেন যে কোন কারণে মহারাজ জয়াপীড় আজ বড়ই চিন্তিত এবং অস্থির।

'দেবশর্মা! তোমার সঙ্গের সেনারা কোথায়?' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন জয়াপীড়।

—'তারা ঐদিকে অপেক্ষা করছে, রাজন।' হাতের ইঙ্গিতে সেনাদের অবস্থিতি নির্দেশ করলেন দেবশর্মা।

—'উত্তম। এসো আমরা এই নদীতীরেই কিছুক্ষণ উপবেশন করি।'

একটি উঁচু মাটির ঢিপির উপরে বসলেন রাজা জয়াপীড়। দেবশর্মা উপবেশন করলেন তাঁর পায়ের কাছে কোমল ঘাসের উপরে।

—'সেনাপতি! এমন অনির্দিষ্ট কালের জন্য আর কত দিন ঘুরে বেড়াবো বলতো? কোথায় যাবো সাহায্য প্রার্থনা করতে? তীর্থযাত্রীর রূপ ধরে কতকাল বসে থাকবো প্রয়াগতীর্থে?'

থামলেন না জয়াপীড়। 'ভাবতে আশ্চর্য লাগে, মাত্র অর্ধশত বৎসর আগে আমার পিতামহ—কাশ্মীররাজ বীর ললিতাদিত্য যখন বিজয়বাহিনী নিয়ে কাশ্মীর থেকে নেমে এলেন উত্তর ভারতের দিকে, তখন আর্যাবর্তের কোন নরপতির সাহস হয় নি—স্পর্ধা হয় নি, সে বিজয়বাহিনীর গতিরোধ করতে। পরপর সব রাজন্যবর্গ তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। একথা তোমার অজানা নয় দেবশর্মা?'

জয়াপীড়ের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

দেবশর্মা নীরবে মাথা নাড়লেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি ঘাসের উপর ন্যস্ত। মহারাজ জয়াপীড়ের ক্ষুব্ধ যন্ত্রণা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারছেন তিনি।

—'এমনকি কান্যকুব্জরাজ গর্বিত যশোবর্মাও পরাজিত হয়ে বাধ্য

হয়েছিলেন আমার পিতামহের অধীনতা স্বীকার করতে। প্রায় সমগ্র পূর্ব ভারত জয় করে যশোবর্মা তাঁর রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার পিতামহের কাছে তাঁকেও পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল।'

গর্বিতভাবে কথাগুলি বলতে বলতে গলার স্বর বিষাদপূর্ণ হয়ে গেলো জয়াপীড়ের। তিনি দেবশর্মার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কিন্তু দিগ্বিজয়ী সম্রাট ললিতাদিত্যের পৌত্র, জয়াপীড় বিনয়াদিত্যের আজ কি দশা!'

দেবশর্মা আবার মাথা নত করলেন। জয়াপীড়ের চিত্তচাঞ্চল্য তাঁকেও ব্যথিত করে তুলেছে।

জয়াপীড় ধীর গলায় বলে চললেন, 'তোমার মতো কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী এখনো আমার সঙ্গ ছাড়ে নি। কিন্তু বলতে পারো বন্ধু—আর কতকাল তীর্থযাত্রীর বেশে প্রয়াগতীর্থে বসে থাকবো সাহায্যের প্রতীক্ষায়? আমার পিতৃপুরুষের রাজত্ব উদ্ধার করতে কে আমাকে সাহায্য করবে? কোন সামন্তরাজ এখনো ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের বংশধরের প্রতি অনুগত?'

বলতে বলতে বড় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, জয়াপীড়।

কিছুক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন নদীর দিকে তাকিয়ে। তারপর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথা বললেন বিনয়াদিত্য জয়াপীড়, 'দেবশর্মা! অনেক অর্থ চাই, চাই লোকবল। কিন্তু কিছুই যে এখন আমার নেই। উত্তর ভারতের যে সব নরপতি আমার পিতামহের অনুগত সামন্তরাজ ছিলেন, তাঁরা আমার আগমনবার্তা পেয়েও এগিয়ে আসেন নি। আমাকে সম্মান পর্যন্ত দেখান নি। সাহায্যের প্রস্তাব তো পরের কথা—'।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

দেবশর্মার নত মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আহতকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমার পিতামহের প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে

এলাম—কিন্তু কেউ কি কাশ্মীরপতিকে উপযুক্ত মর্যাদা দেখিয়েছে? কেউ না—কেউ না—'।

অধৈর্যভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে কথা শেষ করে অস্থির পদচারণা শুরু করলেন, জয়াপীড়।

নীরবে উঠে দাঁড়ালেন দেবশর্মাও। তাঁরও মুখ বিষণ্ণ এবং উৎকণ্ঠিত।

গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে জয়াপীড়ের মুখে চোখে কপালে। সেই আলোতেও দেবশর্মা পরিষ্কার দেখতে পেলেন জয়াপীড়ের চোখ দুটি জ্বলছে—দুটি হীরক খণ্ডের মতো।

আরো কয়েকবার অস্থিরভাবে পদচারণা করে জয়াপীড় এসে দাঁড়ালেন দেবশর্মার সামনে।

—'সামন্ত রাজন্যবর্গের কাছে আমার অবস্থা এখন গলিতনখদন্ত সিংহের মতো।' ধারালো ব্যঙ্গের হাসি ফুটলো তাঁর মুখে। 'সকলেই জানে কাশ্মীর সিংহাসনে এখন অধিষ্ঠিত জজ্জ। আমার শ্যালক জজ্জ! তাকে আমি বড় স্নেহ করতাম। বিশ্বাস করতাম বন্ধুর মতো। তাই এমন ব্যবহার সে করলো আমার সঙ্গে!'

উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাস পড়তে থাকে কাশ্মীরনাথ বিনয়াদিত্যের।

আর নীরব থাকতে পারলেন না দেবশর্মা। এগিয়ে এসে বিনীত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'মহারাজ, আমার অপরাধ নেবেন না। আজ আপনার আহারাদি কিছুই হয় নি। আপনি বিশ্রাম করবেন চলুন। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আপনার স্নায়ুমণ্ডলী। আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ, দেবশর্মা। আমি সত্যিই বড় ক্লান্ত, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।' জয়াপীড় বলতে থাকেন, 'কিন্তু সেনাপতি, আজ আমি একটি সুখবর পেয়েছি। সেই কারণেই আমি একাকী এই নির্জন নদীতীরে চলে এসেছিলাম, একাকী বসে চিন্তা করে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করবো বলে।'

জয়াপীড়ের কণ্ঠস্বরে প্রফুল্লতার সুর। তাঁর মুখের চিন্তাকুল উদ্বেগের ছাপ কেটে গেছে।

'সুসংবাদ আছে, দেবশর্মা।' প্রফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন, কাশ্মীরপতি। 'উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গ স্বরাজ্যচ্যুত কাশ্মীররাজের প্রতি আনুগত্য না দেখালেও, পুণ্ড্রবর্ধনের সামন্ত নরপতি জয়ন্ত কিন্তু এখনও আমার প্রতি অনুগত।'

দেবশর্মা চকিত বিস্ময়ে তাকালেন কাশ্মীরপতির দিকে।

হাসলেন জয়াপীড়। শান্ত গলায় বললেন, 'এ সংবাদ আমি আজ দ্বিপ্রহরে জেনেছি, গূঢ় পুরুষের মুখে। দেবশর্মা, তুমি বুঝতে পারছো, এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আমার জীবনে এই সংবাদের কি মূল্য! নিরাশার অন্ধকারে ঐ একটি মাত্র আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি আমি। দেখি, কি হয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়ালেন জয়াপীড়। শান্তকণ্ঠে বললেন, 'চলো দেবশর্মা, এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।'

নির্জন নদীতীর পিছনে রেখে দুজনে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে।

প্রভুভক্ত অশ্বটি অনেকক্ষণ পরে প্রভুকে দেখে হ্রেষা-ধ্বনি করলো।

অশ্বারোহী সৈনিকেরা অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে ঘাসের উপর বিশ্রাম করছিল। নিম্নস্বরে কথা বলছিল তারা নিজেদের মধ্যে।

রাজা এবং সেনাপতিকে এগিয়ে আসতে দেখে, সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো তারা।

॥ দুই ॥

রাজশিবিরে রাজশয্যায় শুয়েছিলেন রাজা জয়াপীড়।

ঘুম ছিল না তাঁর চোখে।

গভীর রাত্রি। চারদিক নিস্তব্ধ। সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন।

মাঝে মাঝে অদূর মন্দুরা থেকে কানে আসছে—বহু অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। কখনো কখনো কঠিন মাটিতে অশ্বক্ষুরাঘাত ধ্বনিত হচ্ছে।

এক লক্ষ অশ্ব!

এক লক্ষ অশ্ব রয়েছে—জয়াপীড়ের মন্দুরায়। এখনও।

সৈন্যেরা যদিও সব বিদায় নিয়ে ফিরে গেছে দেশে।

রয়ে গেছে তাদের বাহন। রাজকীয় অশ্বশালার অশ্বগুলি।

এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পিতামহের অনুসরণে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন জয়াপীড়। কাশ্মীরের নবীন নরপতি।

ললিতাদিত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশাল সাম্রাজ্য।

সমগ্র আর্যাবর্ত— পূর্বভারত জুড়ে। দক্ষিণেও কর্ণাটক পার হয়ে এগিয়েছিলেন আরো দক্ষিণে। পশ্চিমে দ্বারকা পর্যন্ত ছিল তাঁর অধিকারে।

কিন্তু আজ!

শিবিরের এককোনে দীপাধারে দীপ জ্বলছে।

প্রদীপের মৃদু আলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিনিদ্র নরপতি।

অদৃষ্টের কি বিচিত্র পরিহাস!

পিতামহের শৌর্যবীর্যের খ্যাতি ছড়িয়েছিল আসমুদ্র হিমাচল।

আরব এবং তুর্কীরাও তাঁর বীরত্বে স্তম্ভিত হয়েছিল।

মধ্য এশিয়া পর্যন্ত তাঁর বীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

আর আজ ?

দীপাধারের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন জয়াপীড়।

নির্জন নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে জ্বলছে একটি মাত্র দীপ।

আর নিরাশার অন্ধকারে ডুবে থাকা তাঁর মনে, আশার প্রদীপ জ্বলার মতই জ্বলছে একটি আশার বাণী—পুণ্ড্রবর্ধনরাজ জয়ন্ত এখনও তাঁর প্রতি অনুগত।

কিন্তু— ? ভাবতে গিয়ে নিজেই লজ্জিত হলেন জয়াপীড়।

দিগ্বিজয়ী সম্রাট ললিতাদিত্যের চরিত্রের এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের স্মৃতি জড়িয়ে আছে—গৌড় দেশের সঙ্গে।

কি মতিভ্রমই হয়েছিল বীর কাশ্মীরপতির !

কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মা পরাজিত হলে, কান্যকুব্জের অধীনস্থ গৌড়ের দিকে দৃষ্টি পড়লো ললিতাদিত্যের।

গৌড়পতি কয়েকটি হাতি আর মূল্যবান উপহার দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন বিজয়ী সম্রাট ললিতাদিত্যকে। বিনা যুদ্ধেই গৌড়পতি গোসাল কাশ্মীররাজের অধীনতা স্বীকাব করে নিলেন।

প্রসন্ন হলেন ললিতাদিত্য।

গৌড়পতি গোসাল কাশ্মীরপতির বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে ললিতাদিত্যের কাছে কয়েকটি প্রার্থনাও জানালেন।

আসলে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন গৌড়পতি।

তাঁর প্রতিবেশী রাজাদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল গৌড়ের উপর। তাদের নিবৃত্ত করার একটি পথ খুঁজে বার করা দরকার। এজন্য ললিতাদিত্যের অনুগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাঁর।

গৌড়পতি গোসালকে কাশ্মীরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আদেশ দিয়ে, দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হলেন ললিতাদিত্য।

দেশের পর দেশ জয় করার উল্লাসে তখন তিনি উন্মত্ত।

কারো কোন প্রার্থনা শোনবার মতো তাঁর অবকাশ নেই।

একটি ক্ষীণ হাসির রেখা জেগে উঠলো কাশ্মীরপতি জয়াপীড়ের ঠোঁটের কোনে। ললিতাদিত্যের কি অপূর্ব বীরত্ব আর ব্যক্তিত্ব! সমগ্র উত্তর ভারত তখন তাঁর পদানত।

আর আজ? তাঁর পৌত্র রাজ্যচ্যুত বিনয়াদিত্য জয়াপীড় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আশ্রয়ের সন্ধানে!

এদিকে গৌড়পতি গোসাল পড়েছিলেন সঙ্কটে। সুদূর কাশ্মীরের পথে তাঁর যাওয়া উচিত কিনা এ নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছিলেন।

কিন্তু ললিতাদিত্য তাঁর বিজয়ী প্রভু। তিনি সামান্য সামন্ত রাজা।

অগত্যা কাশ্মীরে যাওয়াই স্থির করেছিলেন গৌড়পতি।

ললিতাদিত্য আদেশ দিয়ে গেছেন তাঁকে।

সামান্য কয়েকজন অনুচর নিয়ে গোসাল কাশ্মীর যাত্রা করলেন।

কাশ্মীরে গিয়ে কিন্তু ললিতাদিত্যের কাছে প্রত্যাশামতো সমাদর পেলেন না, গৌড়পতি।

ললিতাদিত্য বেশ রূঢ় ব্যবহার করলেন তাঁর সঙ্গে।

কঠোর ভাষায় তিনি জানিয়েছিলেন, যশোবর্মার পরাজয়ের পরেও যে গোসাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন আছেন, সে কেবল পরিহাস-কেশবের অনুগ্রহ।

পরিহাসকেশব—রজতময় বিশাল বিষ্ণুমূর্তি।

দিগ্বিজয়ের পর কাশ্মীরে নতুন নগর প্রতিষ্ঠা করেছেন বিজয়ী কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য—পরিহাসপুর।

সেই পরিহাসপুরেই স্থাপিত করেছেন পরিহাসকেশবের মূর্তি। আরো একটি রজতময় মূর্তি—রামস্বামীরও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন ললিতাদিত্য।

কাশ্মীরপতির গর্বোদ্ধত আচরণে মনে ব্যথা পেলেন গোসাল। অপমানিত বোধ করলেন। তিনি অনুগ্রহ চাইতে এসেছেন সত্য, কিন্তু তিনি ললিতাদিত্যের আমন্ত্রণেই এসেছেন কাশ্মীরে।

গৌড়পতিকে গৌড়ে ফিরে যেতে আদেশ করলেন ললিতাদিত্য।

তিনি অবশ্য সেইসঙ্গে পরিহাসকেশবের নামে শপথ করে বললেন, গৌড়পতি গেসালের কোন ভয় নেই। কেউ তাঁর কোন ক্ষতি করবে না। তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না কেউ।

কাশ্মীরপতির কথায় গৌড়পতি ক্ষুণ্ণ মনে দেশে ফিরে চললেন। কিন্তু দেশে পৌঁছতে পারলেন না।

কাশ্মীরের ত্রিগামী নামক স্থানে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ গেলো তাঁর।

পরে প্রকাশ পেলো, ললিতাদিত্যের আদেশেই এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ললিতাদিত্য এমন কাজ কেন করেছিলেন—অনেক ভেবেও বুঝে উঠতে পারেন না জয়াপীড়।

ললিতাদিত্য দিগ্বিজয়ী সম্রাট!

সামান্য সামন্তরাজকে প্রীতির চোখে দেখলে, শতগুণে তিনি মহৎ হয়ে উঠতেন সকলের কাছে।

কিন্তু তিনি কেন এমন করে গুপ্তহত্যা করালেন?

গভীর রাতে রাজশিবিরের শয্যায় শুয়ে সেই কথাই ভাবছিলেন জয়াপীড়।

মানুষের মন বড় বিচিত্র!

কারো সাধ্য নেই—কার মনে কি আছে, তা উপলব্ধি করে।

তার প্রিয় শ্যালক জজ্জের মনোভাবও কি তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন?

আবার ললিতাদিত্যের কথাই চিন্তা করতে লাগলেন জয়াপীড়। নিদ্রাহীন রাতে চিন্তাই তাঁর সঙ্গী।

ললিতাদিত্যের প্ররোচনায় গোসালের গুপ্তহত্যার সংবাদে—ক্ষোভে, অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো গৌড়বাসী। ললিতাদিত্যের এই হীন চক্রান্তের প্রতিশোধ নেবার জন্য গৌড়বীরেরা সচেষ্ট হলো।

গৌড়রাজের চোদ্দজন বীর অনুচর প্রস্তুত হলো।

তীর্থযাত্রীর বেশে কাশ্মীরের সারদাতীর্থ দর্শনের ভান করে কাশ্মীরের দিকে চললো তারা। পথকষ্ট, প্রাণভয় তুচ্ছ হয়ে গেলো তাদের কাছে।

তাদের লক্ষ্য পরিহাসপুর।

পরিহাসপুরের যে কেশববিগ্রহকে মধ্যস্থ রেখে ললিতাদিত্য গৌড়পতিকে অভয় দিয়েও মিথ্যাচার করেছেন, মিথ্যাচারের সাক্ষী সেই বিগ্রহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে তারা।

এইভাবেই অপমান আর মিথ্যাচারের শোধ নেবে।

পরিহাসপুরে উপস্থিত হয়ে তীর্থযাত্রীর বেশ খুলে ফেললো তারা।

খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে চোদ্দজন বীর ছুটে চললো পরিহাস-কেশবের মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে বলে।

তাদের উগ্র রূপ দেখে পরিহাসকেশব মন্দিরের পুরোহিতেরা তাড়াতাড়ি মন্দিরদ্বার বন্ধ করে দিলেন।

পাশেই খোলা ছিল রৌপ্যময় রামস্বামীর মন্দির।

গৌড়বীররা সেই মূর্তিকেই পরিহাসকেশবের মূর্তি ভেবে চূর্ণ করে দিলো।

এদিকে গৌড়সেনারা মন্দির আক্রমণ করেছে সংবাদ পেয়ে, সেইখানে ছুটে এলো দলে দলে কাশ্মীরী সেনা।

সবাই মিলে তারা অক্রমণ করলো গোড়বীরদের।

একদিকে অসংখ্য কাশ্মীরী সৈন্য আর অন্যদিকে দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত মাত্র চোদ্দজন গৌড়বীর। কিন্তু তারা হার মানে নি।

প্রাণপণে দ্ধ করেছিল তারা।

অবশেষে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন নিয়ে, ধূলির পরে একে একে লুটিয়ে পড়লো তাদের নিষ্প্রাণ দেহ।

গৌড়বীরদের রক্তে পবিত্র হলো সুদূর কাশ্মীরের ধূলি।

এখনও রামস্বামীর মন্দির শূন্যই পড়ে আছে। নতুন বিগ্রহ স্থাপন করা হয় নি সেখানে।

এখনও কাশ্মীরের অধিবাসীরা গৌড়বীরদের অসীম বীরত্বের কথা বলাবলি করে। গৌড়বীরদের প্রভুভক্তি আর সাহসের কথা বর্ণনা করে, গান গায়,—কবিতা লেখে তারা।

তারা বলে গৌড়বীরদের রক্তে কাশ্মীরের ধূলি পবিত্র হয়ে গেছে।

শয্যায় শুয়ে এইসব কথাই চিন্তা করছিলেন জয়াপীড়। গূঢ়-পুরুষের মুখে কাশ্মীররাজের প্রতি গৌড়বাসীদের আনুগত্যের কথা শুনে বিস্মিত এবং চমৎকৃত হয়েছেন তিনি। এই বিপদের মধ্যে আশ্বস্তও হয়েছেন।

সেইসঙ্গে বড় অনুতাপও হচ্ছে। পিতামহ ললিতাদিত্য এমন অবিমৃষ্যকারিতা করলেন কেন ?

ভাগ্যের কি পরিহাস !

সাহায্যের প্রার্থনা নিয়ে এখন কাশ্মীরের রাজ্যচ্যুত নৃপতিকে সেই গৌড়ীয় সামন্তরাজের কাছেই যেতে হবে হয়তো।

একেই বলে অদৃষ্ট !

চিন্তার যেন শেষ নেই আজ রাত্রে। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

কাশ্মীরপতি জয়াপীড় শয্যা ছেড়ে উঠে স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে পান করলেন সুশীতল বারি।

কোন পরিচারককে আহ্বান করলেন না।

এই রাত তাঁর নিজস্ব চিন্তার রাত যেন।

শিবিরের মধ্যে বার কয়েক পদচারণা করে আবার শয্যায় এসে বসলেন।

কিন্তু উপায়ই বা কি ?

ললিতাদিত্য প্রায় সপ্তত্রিংশতি বৎসর ধরে রাজ্যশাসন করেছিলেন। তারপর উত্তর কুরুতে এক অভিযান চালাবার সময়, বিশাল বাহিনী সমেত তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন।

কোন প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ? কে জানে ?

কি কারণে এসব ঘটনা ঘটলো, আজও কেউ তার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

তবে রাজসিংহাসন তো শূন্য থাকে না।

ললিতাদিত্যের পর—কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবলয়পীড়।

কুবলয়পীড় ন্যায়পরায়ণ তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসনে তাঁর মন ছিল না।

তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ পুরুষ। রাজ্যশাসনের চাইতে সাধন-ভজনই বেশি পছন্দ ছিল তাঁর।

তাই মাত্র একবৎসর রাজত্ব করেই তিনি সিংহাসন ত্যাগের সঙ্কল্প নিলেন।

অমাত্য আর রাজপুরুষেরা অনেক অনুনয় করেছিলেন তাঁকে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করবার জন্য। কিন্তু কুবলয়পীড় কারো অনুরোধেই কর্ণপাত করলেন না।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বজ্রাদিত্যের উপর শাসন ভার দিয়ে নির্জন কাননে সাধন-ভজন করতে চলে গেলেন, তিনি।

তখন মনের দুঃখে সস্ত্রীক বিতস্তার জলে প্রাণ বিসর্জন করলেন প্রবীণ মন্ত্রী মিত্রশর্মা, সেনানায়ক দেবশর্মার পিতা।

মিত্রশর্মা বুঝেছিলেন কুবলয়পীড়ের পরবর্তী রাজারা কত অযোগ্য, তাই বারবার কুবলয়পীড়কে সিংহাসন ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন।

পিতা বজ্রাদিত্যের কথা মনে পড়তে, এত চিন্তা আর উৎকণ্ঠার মধ্যেও কেমন বেদনামিশ্রিত কৌতুক অনুভব করলেন জয়াপীড়।

দিগ্বিজয়ী সম্রাট ললিতাদিত্যের পুত্র কত অযোগ্য হতে পারেন, তাঁকে না দেখলে একথা কারো বিশ্বাস হতো না। বিচক্ষণ মন্ত্রী মিত্রশর্মা সত্যই বুঝেছিলেন।

অগত্যা বজ্রাদিত্যের কুশাসনে বিরক্ত হয়ে অমাত্যেরা কাশ্মীরের

সিংহাসনে বসালেন বজ্রাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে। তিনি জয়াপীড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন নতুন নরপতি।

কিন্তু দেখা গেলো যে নতুন রাজাও রাজ্য পরিচালনার কাজে অতি অযোগ্য, তিনিও সেনানায়ক আর মন্ত্রীদের সন্তুষ্ট করতে পারলেন না।

তাঁর কুশাসনে এবং অক্ষমতায় কাশ্মীরে গণবিক্ষোভ দেখা দিলো।

ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর আট বছর ধরে চললো এমন অরাজকতা।

অবশেষে অমাত্যেরা সর্ব-সম্মতিক্রমে বজ্রাদিত্যের কনিষ্ঠপুত্রকে কাশ্মীরের সিংহাসনের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করলেন।

বিনয়াদিত্য জয়াপীড় হলেন কাশ্মীরের নতুন নরপতি।

কাশ্মীরের সিংহাসনের পক্ষে জয়াপীড়ের নির্বাচন খুবই সঙ্গত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। নিজেকে সিংহাসনের উপযুক্তই মনে করতেন জয়াপীড়।

অতি তরুণ বয়সী হলেও তিনি বুদ্ধিমান এবং বীর। একথা কাশ্মীরের প্রধান অমাত্যদের অজানা ছিল না। ললিতাদিত্যের সঙ্গে তাঁর অনেক সাদৃশ্য, একথা অনেকেই বলাবলি করতেন।

জয়াপীড় নিজেও কি মনে মনে কখনও কাশ্মীর সিংহাসনের কথা ভাবেন নি ?

রাজশিবিরে শয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি সে কথাই আবার ভাবলেন।

'হ্যাঁ, আমি অতি উচ্চাভিলাষী ছিলাম।' মনে মনে স্বীকার করলেন জয়াপীড়। 'কাশ্মীরসিংহাসনের উপর আমার দৃষ্টি ছিল। কিন্তু অন্যায় কৌশলে সিংহাসন হস্তগত করার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার ছিল না। শৌর্যবীর্য এবং চরিত্রবলেই তা আমি লাভ করতে পারি, এমন বিশ্বাস আমার ছিল'। অস্ফুট কণ্ঠে একথা নিজেকেই যেন শোনালেন তিনি। জয়াপীড় আবার ডুবে গেলেন চিন্তার মধ্যে।

কাশ্মীর সিংহাসনে বসলেন বিনয়াদিত্য জয়াপীড়। পিতামহ ললিতাদিত্যের মতোই দিগ্বিজয়ী সম্রাট হবার আশা পোষণ করতেন

মনে মনে। সেই মতো এক বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হলেন তিনি।

তাঁর অনুপস্থিতিতে কাশ্মীররাজ্য সুশৃঙ্খলে পরিচালনা করার চিন্তাও তিনি করে রেখেছিলেন। সব কাজ যাতে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলে, সেইজন্য রাজ্যের শাসনভার দিলেন শ্যালক জজ্জের উপরে।

জজ্জও রাজকুলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, রাজরক্ত গায়ে আছে তাঁর। এ কাজ তিনি পারবেন বলেই জয়াপীড়ের বিশ্বাস ছিল।

এরপর শুভদিন দেখে, দেবতা ও ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়লেন জয়াপীড় বিনয়াদিত্য—কাশ্মীরের তরুণ নরপতি।

কাশ্মীর থেকে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন, এমন সময় এলো দুঃসংবাদ। তাঁর শ্যালক জজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে জজ্জ বলপূর্বক কাশ্মীরসিংহাসন অধিকার করেছে।

সে কথা ভেবে আজও নির্জন নিশীথে রাগে সারা দেহ কাঁপতে থাকে জয়াপীড়ের।

দুঃসংবাদ কানে যাওয়া মাত্র ক্রোধে অধীর হয়ে জয়াপীড় সৈন্যদের আদেশ দিলেন কাশ্মীরে ফিরে যাবার জন্য। সেইখানে ফিরে জজ্জের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা হবে। জজ্জকে তিনি কঠিন শাস্তি দেবেন।

কিন্তু জজ্জ ইতিমধ্যেই গোপনে গোপনে সেনাবাহিনীর অনেককেই বশীভূত করে রেখেছে, তখনই বোঝা গেলো।

কাশ্মীরে ফিরে জজ্জের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ঘোরতর অনিচ্ছা দেখা গেলো সৈন্যদের মধ্যে। তাদের অনেকেই গোপনে শিবির ছেড়ে পলায়ন করলো।

তাদের দেখাদেখি আরো কিছু সৈন্য নতুন রাজার আদেশ অমান্য করে ফিরে গেলো দেশে—প্রিয় পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হবে বলে।

ক্ষোভে, ঘৃণায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জয়াপীড়।

এত অধঃপতন ঘটেছে কাশ্মীরের অধিবাসীদের মধ্যে!

কোথায় গেলো পিতামহ ললিতাদিত্যের সেই কঠিন শাসন? নিয়মাধীন পরিচালনা? সুনিয়ন্ত্রিত সৈন্যবাহিনী?

এ সবই গত আট বছরের কুশাসনের ফল।

সকলেই ক্ষমতালোভী অর্থলোভী হয়ে উঠেছে।

হীন চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছে অমাত্য আর সেনানায়কেরা।

ক্ষোভে দুঃখে আর স্বদেশে ফিরলেন না জয়াপীড়।

সেনানীদের দেশে ফেরবার আদেশ দিলেন কঠিন মুখে।

তারা ফিরে গেলো দেশে।

আর রাজ্যচ্যুত কাশ্মীররাজ জয়াপীড় কি করলেন?

তাঁর সঙ্গে রয়ে গেলো মুষ্টিমেয় কিছু সৈন্য আর অনুগত অনুচর।

আর রইলেন স্বর্গত মন্ত্রী মিত্রশর্মার পুত্র—সেনাপতি দেবশর্মা।

তাঁর বাল্যসহচর, প্রিয়বন্ধু।

সহায়-সম্বলহীন জয়াপীড় কোথায় ফিরবেন?

পিতৃরাজ্য বলপূর্বক হরণ করেছে শ্যালক জজ্জ, যাকে তিনি এত বিশ্বাস করতেন।

আর্যাবর্তের সামন্তেরা নিরপেক্ষ দর্শকের মতো আচরণ করছে।

এমন সময় এই ঘোর বিপদে পড়ে মনে গেলো তাঁর পরম হিতৈষী, কাশ্মীর রাজপরিবারের গ্রহাচার্যের কথা।

গ্রহাচার্য গণনা করে বলেছিলেন ললিতাদিত্যের পর কাশ্মীরের সিংহাসনে বসবেন জয়াপীড়। দীর্ঘকাল রাজত্ব করবেন তিনি।

তবে কিছুটা সময়, প্রায় তিন বৎসর কাল চরম আশাভঙ্গ অশান্তি আর মনোকষ্টের মধ্যে কাটাতে হবে তাঁকে। তখন পূর্বদেশ থেকে তাঁর সেই ভাগ্য উদয় হবে।

সেইমতো মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে পূব দিকে এগিয়ে চললেন জয়াপীড়।

পিছনে স্বপ্নের মতো পড়ে রইলো স্বরাজ্য কাশ্মীর। নববধূ, প্রিয় পরিজনেরা।

পুবদিকে এগোতে লাগলেন জয়াপীড়।

কিন্তু তাঁর বাসনা পূর্ণ হবার সামান্যতম ইঙ্গিতও পেলেন না কোথাও।

পিতামহের অধীনস্থ সামন্তেরা তখন প্রায় স্বাধীন। কাশ্মীর রাজ্যের গৃহবিবাদের সূচনায় পরম সন্তুষ্ট তারা।

কোন রাজাই আনুগত্য দেখাতে এগিয়ে এলেন না। সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও পেলেন না জয়াপীড়।

প্রায় সারারাত বিনিদ্র থেকে ভোরের দিকে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলেন কাশ্মীরের রাজ্যচ্যুত নরপতি।

॥ তিন ॥

কয়েকদণ্ডমাত্র নিদ্রা হলো তাঁর।

যথারীতি সূর্যোদয়ের দু' দণ্ড পরেই জেগে উঠলেন জয়াপীড়।

স্নান এবং ইষ্টপূজার পর শিবিরে একাকী বসে গত রাতের কথা চিন্তা করছিলেন, জয়াপীড় বিনয়াদিত্য।

আবার তাঁর মনে পড়লো গ্রহাচার্যের কথা।

ভাগ্যবিড়ম্বনার সময় পূর্বদেশ থেকে সাহায্য পাবেন তিনি।

কথাটি মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেলো তাঁর সর্বাঙ্গে। পুণ্ড্রবর্ধন তো পূর্বেই!

তার মানে গৌড়দেশেই যেতে হবে তাঁকে!

দূর মন্দুরা থেকে অশ্বদের হ্রেষাধ্বনি কানে ভেসে এলো।

ভাগ্যোদয়ের শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে এবার।

তার আগে অশ্বগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

জয়াপীড় বেশ পরিবর্তন করলেন।

রাজপোষাক আর মূল্যবান অলঙ্কারগুলি খুলে রেখে সাধারণ বেশ পরে শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন।

নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে দেখা যাক। পরিচয় না জানিয়ে। একবার ভাবলেন সেনাপতি দেবশর্মাকে সঙ্গে নিলে কেমন হয়?

পরমুহূর্তে সে চিন্তা ত্যাগ করলেন।

—'না, একাকীই সাধারণ বেশে ঘুরে দেখি', মনে মনে সঙ্কল্প করলেন।

মূল শিবির থেকে বেরোবার সময় সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসেছিল কয়েকজন অনুচর।

দেবশর্মার কঠিন আদেশ। মহারাজ যেন একাকী না যান কোথায়ও।

'মহারাজ, আপনার অশ্ব ?' একজন প্রশ্ন করলো।

হাত নেড়ে তাদের সকলকে নিরস্ত করলেন, জয়াপীড়। পদব্রজেই যাবেন তিনি।

অনিচ্ছুক পায়ে ফিরে গেলো অনুচরেরা।

জয়াপীড় এগিয়ে চললেন।

পথে চলতে চলতে সেনাপতি দেবশর্মার কথা ভাবছিলেন জয়াপীড়।

তাঁর সদাসতর্ক দৃষ্টি রয়েছে জয়াপীড়ের উপর।

গুপ্তহত্যার ভয়ে সর্বদা উৎকণ্ঠিত দেবশর্মা।

জজ্জ কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেছে অন্যায়ভাবে, তাছাড়া সে নিষ্কণ্টক নয়। জয়াপীড় এখনও জীবিত।

তাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে নিশ্চিন্ত হয় জজ্জ।

তাই দেবশর্মা জয়াপীড়ের জন্য চিন্তিত থাকেন সর্বক্ষণই।

জয়াপীড়ের মুখে ফুটেছিল রহস্যময় হাসি।

মানুষের সঙ্গে মানুষের কত প্রভেদ!

একজন চায় নিশ্চিহ্ন করতে, অবশ্য তার স্বার্থ আছে।

আর একজন চায় নিঃস্বার্থভাবে তাঁকে বাঁচাতে। সারাক্ষণ তাঁর প্রতি তার সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি।

আজও গঙ্গাতীরে ঘুরতে লাগলেন জয়াপীড়। তবে তিনি লোকালয়ের দিকেই গেলেন, নির্জন প্রান্তে গেলেন না।

গঙ্গাতীরে কতকগুলি বিশ্রামমণ্ডপ আছে, দেখলেন তিনি। মণ্ডপগুলি প্রস্তরমণ্ডিত। মণ্ডপগুলির মাথায় কারুকার্যশোভিত প্রস্তরের চন্দ্রাতপ। মণ্ডপগুলি কারুকার্যময় স্তম্ভের উপর বিন্যস্ত।

তারই একটিতে বসলেন জয়াপীড়।

তার চোখে পড়লো মণ্ডপের এক প্রান্তে একজনকে ঘিরে কিছু লোকের জটলা।

জয়াপীড় বয়সে তরুণ। কৌতূহল হলো তাঁর। তিনি দীর্ঘদেহী। গ্রীবা সামান্য তুলে দেখলেন, এক প্রৌঢ় জ্যোতিষীকে ঘিরে কিছু লোক পরিহাস করছে, কটু মন্তব্য করছে।

প্রৌঢ় রীতিমত উত্তেজিত।

তাঁর সামনে উপবিষ্ট এক তরুণী, নতমুখী সে। তার পাশে মধ্য-বয়স্কা রমণী। সুসজ্জিতা, সালঙ্কারা। মনে হয়, সম্পন্ন ঘরের ঘরণী। রমণীও উত্তেজিত স্বরে তর্ক করছে, জ্যোতিষীর সঙ্গে।

প্রৌঢ় জ্যোতিষীর কণ্ঠ বেশ উচ্চ গ্রামে চড়েছে।

—'শিবমিশ্রের গণনায় কখনও ভুল হয় না। আমার গণনা ভুল হলে আমার সব পুঁথিপত্র এই গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবো।'

'কিন্তু তাই বলে—' রমণী আরো কি বলতে গেল, কিন্তু তার সঙ্গীরা তাকে থামিয়ে দিলো।

অগত্যা রমণী তরুণীটির হাত ধরে টান দিল।

—'চল্, চল্। বৃথা কালক্ষেপ হচ্ছে। জ্যোতিষী না ভণ্ড! মুখে যা আসবে তাই বলবে! বড় অহঙ্কার।'

বলতে বলতে চারপাশের লোকজনদের সরিয়ে পথ করে চলে গেলো রমণী আর তার সঙ্গীরা।

শিবমিশ্রের চারপাশে তখনো কৌতূহলী জনতার ভীড়।

তাদের দিকে তাকিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে শিবমিশ্র বলে উঠলেন,

'যাও, যাও, বেশি বাক্যব্যয় করবে না। আমি জানি আমার গণনা অভ্রান্ত। হুঁ, বড় বংশ। বড় বংশ হলেই ভাগ্যবতী হয় না সকলে। এর অন্যত্র বিবাহের চেষ্টা না করলে, এ মেয়ের অচিরে বৈধব্য যোগ।'

কথা থামিয়ে পুঁথিপত্রে মন দিলেন জ্যোতিষী। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'জ্যোতিষ নিয়ে তর্ক! অর্বাচীনের দল।'

জয়াপীড় কৌতূহলী দৃষ্টিতে শিবমিশ্রকে লক্ষ্য করছিলেন।

লোকটির বয়স মধ্য-পঞ্চাশ পার হয়েছে নিশ্চয়।

কৃষ্ণবর্ণ। মুণ্ডিত মস্তক। মাথার পিছনে শিখায় একটি জবাফুল প্রলম্বিত। পরনে রক্তবর্ণের বস্ত্র এবং রক্তবর্ণের উত্তরীয়। গলায় রুদ্রাক্ষ এবং স্ফটিকের মালা। প্রশস্ত ললাটে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। নাকটি শুকপক্ষীর চঞ্চুর মতো।

ব্যাঘ্রচর্মের আসনে বসে আছেন জ্যোতিষী। সামনে কাষ্ঠ-আধারে পুঁথি খোলা রয়েছে। একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব. তাতে সন্দেহ নেই।

শিবমিশ্রও পুঁথি থেকে চোখ তুলে একদৃষ্টে জয়াপীড়কে নিরীক্ষণ করছিলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠলো রহস্যময় হাসি। চোখের দৃষ্টিতে জেগে উঠলো কৌতূহল।

তার চারপাশের জনতার ভিড় বেশ কমে গেছে।

জয়াপীড় এবং শিবমিশ্রের দৃষ্টির মিলন হলো।

পরস্পর তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগলেন।

শিবমিশ্রের ঠোঁটের কোনে রহস্যময় হাসি লেগেই রইলো।

জয়াপীড় দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠে জ্যোতিষীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জয়াপীড়ের মুখের উপর থেকে কৌতূহলী দৃষ্টি সরালেন না শিবমিশ্র। একইভাবে তাকিয়ে রইলেন। অনুচ্চ কণ্ঠে বলে চললেন, 'আরোগ্যং, বিজয়ং, রাজ্যং, শত্রুনাশং, ধনাৎ সুখম্, শ্রীযুক্তং রবিজঃ কুর্যাৎ রাহো প্রত্যন্তরে স্থিত।'

জয়াপীড় বিস্মিত হলেন। সচকিত দৃষ্টিপাত করলেন শিবমিশ্রের মুখের উপর।

শিবমিশ্র জয়াপীড়ের দিক থেকে দৃষ্টি সরালেন না। নিজের মনেই যেন বলতে লাগলেন, 'কার্যসিদ্ধিং শুভৈশ্বর্যং বস্ত্র ভূষণ ধর্মতঃ, ভবেত্তত্র মনঃপ্রীত রাহো প্রত্যন্তরে স্থিত।'

জয়াপীড় মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলেন।

ব্যাঘ্রচর্মাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শিবমিশ্র। তাঁর কৃষ্ণাভ মুখে গর্বের হাসি।

শিবমিশ্র আসন ছেড়ে এগিয়ে এলেন জয়াপীড়ের দিকে। আগের মতোই অনুচ্চ কণ্ঠে বলে চললেন, 'প্রশস্ত ললাট, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, সিংহ কটি, বিস্তৃত বক্ষপট, আজানুলম্বিত বাহু—রাজলক্ষণ। বিদেশী, আপনি অতি উচ্চবংশীয়। আপনার দুর্দশার কাল শীঘ্রই কেটে যাবে। পূর্বদিকে গমন করুন, আরও পূর্বে, বৃথা কালক্ষেপ করছেন কেন?'

জয়াপীড়ের চোখে উদগ্র বিস্ময়।

তিনি স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন শিবমিশ্রের মুখের দিকে। কিন্তু তাঁর মন অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠছিল। আবার কাশ্মীর রাজ-পরিবারের গ্রহাচার্যের গণনার কথা মনে পড়লো তাঁর।

জয়াপীড় অতিশয় প্রীত হলেন। তিনি ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন শিবমিশ্রকে।

শিবমিশ্র এগিয়ে এলেন জয়াপীড়ের দিকে। মুখে আগের মতোই রহস্যময় হাসি। 'আপনার শত্রুপীড়া, চৌরশত্রুভয়, বন্ধুনাশ, মনস্তাপ, দেশত্যাগ—সব দুঃখেরই অবসানকাল সমাগত', অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন তিনি।

জয়াপীড়ের মনে হলো তিনি যেন দৈববাণী শুনছেন।

এ জ্যোতিষীর গণনা সত্যই যদি নির্ভুল হয়—! হঠাৎ তাঁর দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হলো, দক্ষিণ বাহু কম্পিত হলো।

'আরও পূর্বে এগিয়ে যান বিদেশী, সেখানে আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।' শিবমিশ্র এই বলে, থামলেন। তারপর একটু ভেবে দ্বিধাহীন

কণ্ঠে বললেন, 'আপনার বিবাহযোগও দৃষ্ট হচ্ছে। আপনার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আসবেন অপরূপা রমণীর রূপ ধরে।'

'শিবমিশ্র, আপনি কি সর্বজ্ঞ?' এতক্ষণে কথা বলে উঠলেন, কাশ্মীরপতি জয়াপীড়।

শিবমিশ্রের গণনা শুনতে শুনতে তাঁর এক একবার মনে হচ্ছিল লোকটির কি অসাধারণ গণনা শক্তি! আবার মনের কোনে এ সন্দেহও উঁকি মারছিল—এ ব্যক্তি কোন গুপ্তচর নয়তো! জয়াপীড়ের সব খবর জেনেই সে এসেছে নাকি?

কাশ্মীরপতির মুখের ভাব দেখে শিবমিশ্র কি বুঝলেন কে জানে? ঈষৎ হেসে বলে উঠলেন, 'আমি সর্বজ্ঞ নই, রাজন। হ্যাঁ, আপনাকে রাজনই বলব আমি। আপনার ললাট-লিখন এবং আপনার অবয়বে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ। আমি সামান্য জ্যোতিষী। মানুষের কর-কোষ্ঠি বা ললাট-লিখন বিচার করতে পারি—সে শিক্ষা আমি পেয়েছি আমার গুরুর কাছে।' স্মিত মুখে কথা শেষ করেন জ্যোতিষী।

'শিবমিশ্র, আপনার দেশ কোথায়?' সামান্য সতর্ক হয়ে প্রশ্ন করলেন জয়াপীড়।

—'বারাণসী,' উত্তর দিলেন শিবমিশ্র।

—'আপনার গণনা নির্ভুল হবে কিনা জানি না। তবে এ ভবিষ্যৎ বাণী আমার নিরাশ প্রাণে বিশেষভাবে আশার সঞ্চার করেছে। বিদায়, শিবমিশ্র।'

আর বিলম্ব করলেন না জয়াপীড়। শিবমিশ্রের হাতে চকিতে গুঁজে দিলেন একটি ক্ষুদ্র বস্তু। পরক্ষণে মিশে গেলেন জনতার মধ্যে।

তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন শিবমিশ্র।

শিবমিশ্রের গণনা ভুল হবার নয়। এ ব্যক্তি কোন ভাগ্য-বিড়ম্বিত রাজকুলোদ্ভব। তবে শীঘ্রই এঁর দুর্দশার অবসান হবে। সুদিন সমাগত প্রায়।

তারপর তিনি চোখ ফেরালেন হাতের বস্তুটির দিকে।

সকালের রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠলো একটি বহুমূল্য রত্নাঙ্গুরীয়।

অঙ্গুরীয়টি তুলে দেখতে দেখতে আবার শিবমিশ্রের কৃষ্ণাভ মুখে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠলো।

'আমার ধারণা নির্ভুল। এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে রাজবংশীয়।' অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন শিবমিশ্র।

আত্মতৃপ্ত শিবমিশ্র নিজের মনে মনেই বললেন, 'একটি কথা কিন্তু আপনাকে বলি নি, রাজা। আপনার জীবনে সৌভাগ্যলক্ষ্মী আসছেন অপরূপা রমণীর রূপ ধরে। তবে একটি রমণী নয়। দুই নারী আসছেন আপনার জীবনে। আপনার ভাগ্যোদয় তাঁদেরই ঘিরে'!

॥ চার ॥

শিবমিশ্রের কথাগুলো জয়াপীড়ের মনে প্রবল চঞ্চলতার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মনপ্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল।

শত্রু পরাভবের ক্ষণ সমাগত!

সৌভাগ্যলক্ষ্মী আসবেন রমণীর রূপ ধরে!

বিবাহ যোগ! জয়াপীড়ের মুখে বিচিত্র হাসির আভাস দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেলো।

সুদূর কাশ্মীরে—রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে বিরহিনী নববধূর কথা মনে পড়লো তাঁর। কিন্তু সেই রমণীর ভ্রাতাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাঁর সঙ্গে!

একথা ভাবতেই আবার ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলেন কাশ্মীরপতি। দৃঢ় মুষ্টি তরবারির হাতলের উপর ন্যস্ত করে, গঙ্গাতীর ধরেই চলতে লাগলেন জয়াপীড়।

কিছুদূর অগ্রসর হবার পর, তাঁর চোখে পড়লো গঙ্গাতীরে একটি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত উচ্চ কিন্তু ক্ষুদ্র বেদিকা। সিংহাসনের আকারে নির্মিত। সুন্দর কারুকার্যময়। স্তম্ভ, চন্দ্রাতপ সবই কৃষ্ণপ্রস্তরের।

বেদিকা কিন্তু শূন্য।

এ মণ্ডপটি নদীতীরে অন্য বিশ্রাম-মণ্ডপগুলির মতো নয়। সেগুলি জনাকীর্ণ। এ বেদিকাটি শূন্য। মনে হয় যেন সংরক্ষিত।

'এই বেদিকাটি কি সংরক্ষিত?' জয়াপীড় কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন এক ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণ বয়সে প্রবীণ। গঙ্গাস্নান সেরে মন্ত্র জপ করতে করতে চলেছিলেন।

জয়াপীড়ের প্রশ্ন শুনে ব্রাহ্মণ থামলেন। জয়াপীড়ের আপাদ-মস্তক বারকয়েক নিরীক্ষণ করলেন।

'মহাশয় কি প্রয়াগতীর্থে নবাগত?' ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন জয়াপাড়কে।

'হ্যাঁ, নবাগত। মাত্র কয়েকদিন এসেছি এই তীর্থে।' জয়াপীড় সতর্কভাবে উত্তর দেন।

'হুঁ। প্রশ্ন শুনেই বুঝেছি।' ব্রাহ্মণের গলায় কৌতুকের সুর। পরক্ষণে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'মহাশয়, ঐ বেদিকাটি পুষ্যভূতি বংশীয় থানেশ্বরের রাজা দানশীল হর্ষবর্ধনের। থানেশ্বররাজ প্রয়াগ-তীর্থে এসে দীনদুঃখী ও ব্রাহ্মণদের অকাতরে দান করতেন। সর্বস্ব দান করার পর—পরনের মহার্ঘ বস্ত্রটি পর্যন্ত দান করে দিতেন তিনি। তারপর সামান্য একটি বস্ত্র পরিধান করে ফিরে যেতেন। তাঁর দানশীলতার খ্যাতি আজও প্রয়াগ তীর্থের মানুষেরা মনে রেখেছে। তাই এই স্থানটি দেবস্থানের মতোই গণ্য করা হয়।'

জয়াপীড়ের মনে পড়লো কাশ্মীরে কোন কবির মুখে থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধনের দানশীলতার খ্যাতির প্রশস্তি শুনেছিলেন।

নির্বাক বিস্ময়ে জয়াপীড় তাকিয়ে রইলেন শূন্য বেদিকার দিকে।

ব্রাহ্মণ তাঁর দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে স্বগতোক্তি করতে করতে এগিয়ে চললেন, 'হর্ষবর্ধনের মতো রাজা এ দেশে থাকলে আমাদের মতো দীন ব্রাহ্মণদের কি এমন দুর্দশা হয়? রাজারা আর প্রয়াগ তীর্থে এসে দান-ধ্যান করেন না। তাঁরা এখন সর্বদাই বিলাস ব্যসনে মত্ত।'

পাথরের বেদিকার দিকে তাকিয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ে জয়াপীড়ের মন ভরে গেলো। তিনি যেন তার এক সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন। তাঁর কানে ভেসে এলো তাঁর মন্দুরার লক্ষ অশ্বের ক্ষুরধ্বনি।

এবার পূর্ণোদ্যমে ভাগ্যপরীক্ষার কাজ শুরু করতে হবে। আর বিলম্ব নয়, বিলম্বে কেবল হতাশাই বাড়ে।

জয়াপীড় দ্রুত পায়ে ফিরে চললেন নিজের শিবিরের দিকে।

পাঁচ

রাজশিবিরে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন দেবশর্মা।

বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। রাজা কোথায় গেলেন? এমন সময় ক্লান্ত ঘর্মাক্ত দেহে জয়াপীড়কে ফিরতে দেখে আশ্বস্ত হলেন তিনি।

জয়াপীড় ক্লান্ত হলেও তাঁর মুখের রহস্যময় প্রফুল্লতা দৃষ্টি এড়ালো না, দেবশর্মার। তিনিও মনে মনে আনন্দিত হলেন, রাজার মুখের প্রফুল্লতা দেখে।

পরিচারকেরা খাদ্য পানীয় ইত্যাদি এনে রাখলো জয়াপীড়ের সামনে। একজন পরিচারক তাঁকে ব্যজন করতে লাগলো।

ভোজন শেষ হলে হাত মুখ প্রক্ষালন করে স্থির হয়ে বসলেন, জয়াপীড়।

তাম্বুলপাত্র এনে ধরলো আর এক পরিচারক।

একটি তাম্বুল তুলে মুখে দিলেন কাশ্মীরপতি। হাস্যতরল কণ্ঠে সেনাপতি দেবশর্মাকে বলে উঠলেন, 'সেনাপতি, অবিলম্বে ঘোষকের ব্যবস্থা করো।'

'ঘোষক?' দেবশর্মা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ঘোষকের কি প্রয়োজন মহারাজ? জানতে পারি?'

'প্রয়োজন আছে বন্ধু।' বলে, হাসলেন কাশ্মীরপতি। তারপরে গম্ভীর স্বরে আদেশ করলেন, 'সারা নগরে জানিয়ে দাও যে আগামী পরশু পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণদের আমি আমার লক্ষ অশ্ব দান করবো।

ইঙ্গিতে পরিচারকদের সেই স্থান ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন জয়াপীড়। তাঁর শিবির শূন্য হলো। সেখানে রইলেন জয়াপীড় এবং দেবশর্মা।

'তারপর?' প্রশ্ন করলেন দেবশর্মা। বিস্ময় চাপতে পারছিলেন না তিনি।

'তারপর আর কি হবে?' এক পলক দেবশর্মার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে জয়াপীড় বলে উঠলেন, 'তারপর তোমার সেনাদের কাশ্মীরে ফিরে যেতে আদেশ দেবে তুমি।'

'সে কি মহারাজ? আর আপনি? আমি?' উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করেন, সেনাপতি।

'তুমিও ফিরে যাবে কাশ্মীরে।' ধীর গলায় বললেন জয়াপীড়।

—'মহারাজ—আপনি?' সেনাপতির বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। 'আপনি কোথায় থাকবেন?'

—'আমি?' এতক্ষণ বেশ কৌতুকছলে কথা বলছিলেন জয়াপীড়। এবার আসন ছেড়ে ওঠে দাঁড়িয়ে শিবিরের মধ্যে পদচারণা শুরু করলেন কাশ্মীরনাথ। তাঁর প্রত্যয়পূর্ণ মুখে কৌতুক চাপল্যের কোন চিহ্নমাত্রও নেই, বরং এখন বেশ চিন্তাকুল দেখাচ্ছে তাঁকে।

—'সেনাপতি দেবশর্মা! আমি এবার যাবো আরো পূর্বে—গৌড় দেশে। যাবো পুণ্ড্রবর্ধনে। অদৃষ্ট এখন আমায় কোনপথে চালিত করবে কে জানে!'

—'মহারাজ আপনি একাকী যাবেন? না, তা হবে কি করে? আপনার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করুন। চলুন, আমরা সসৈন্যে পুণ্ড্রবর্ধন যাত্রা করি।'

'না, দেবশর্মা।' শান্ত গলায় বলে উঠলেন জয়াপীড়। 'আমি এবার চলবো অদৃষ্ট পরীক্ষায়। শেষ প্রচেষ্টা আমার। সে পথে কোন সঙ্গী নেই, আমাকে একাকীই চলতে হবে।'

কথাগুলি বলতে বলতে জয়াপীড়ের চোখ পড়লো তরুণ সেনাপতি, প্রিয়বন্ধু এবং বিশ্বস্ত অনুচর দেবশর্মার দিকে। দেবশর্মার মুখ অভিমানে আরক্ত হয়ে উঠছে! ওষ্ঠ হলো দৃঢ়সংবদ্ধ।

তাই দেখে হেসে ফেললেন জয়াপীড়। তিনি এগিয়ে এসে দুটি হাত রাখলেন দেবশর্মার দুই কাঁধে।

দেবশর্মা মাথা নত করলেন।

'শোন বন্ধু।' গভীর স্বরে বলতে লাগলেন জয়াপীড়, 'তোমার সাহায্য ব্যতীত আমি এক পাও অগ্রসর হতে পারবো না। তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। কাশ্মীরে যত রাজভক্ত সেনা আছে গোপনে তাদের সংগঠিত এবং একত্রিত করো।'

ক্রমশঃ তাঁর কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো—'আমি পূর্বদেশ থেকে সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে অগ্রসর হবো কাশ্মীরের দিকে। তখন আমার সঙ্কেত পেয়ে আমার সঙ্গে তুমি মিলিত হবে তোমার বাহিনী নিয়ে। আর তখনই হবে জজ্জের সঙ্গে আমার শেষ সংগ্রাম—কাশ্মীর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে।'

কথার শেষে আবেগরুদ্ধ হয়ে যায় জয়াপীড়ের কণ্ঠস্বর। তাঁর সুগৌর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে।

অভিভূত হয়ে কাশ্মীরপতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুনছিলেন,

সেনাপতি দেবশর্মা। এবার তিনি তরবারিতে হাত রেখে রাজাকে অভিবাদন করে বলে উঠলেন, 'আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো রাজা, প্রাণ দিয়েও— ।'

'না, বন্ধু না।' দেবশর্মাকে বাধা দিয়ে স্মিত মুখে বলে উঠলেন, কাশ্মীরপতি জয়াপীড়। 'তোমার প্রাণ চলে গেলে আমার আর কি বাকি রইলো ? প্রাণটি বাঁচিয়েই তোমাকে কাজ করতে হবে।'

জয়াপীড় বিনয়াদিত্যের স্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন দেবশর্মাও। রহস্য শুনে প্রীত হয়েছেন তিনি।

দেবশর্মার দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইলেন জয়াপীড়। কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললেন, 'গভীর রাতে এক সময় সবার অগোচরে শিবির ত্যাগ করবো, আমি। সৈনিকরাও জানবে না আমি কোথায় চলেছি। জানবে কেবল তুমি। কিন্তু বন্ধু—খুব সাবধান।'

দেবশর্মা মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখে প্রশ্ন।

—'কাশ্মীরে গিয়ে তুমি রটনা করবে প্রয়াগতীর্থ থেকে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছেন কাশ্মীরের রাজ্যচ্যুত নরপতি। গভীর হতাশায় ভুগছিলেন তিনি। আত্মহত্যা করাও বিচিত্র নয়।'

নিজের পরিকল্পনায় নিজেই হাসলেন জয়াপীড়।

সেনাপতির মুখে কিন্তু হাসি নেই। তিনি বড়ই উৎকণ্ঠিত।

জয়াপীড় আবার বলতে শুরু করলেন, 'কাশ্মীরে ফিরে যাবে—এবং এই কথাই জজ্জকে জানাবে তুমি। জজ্জ নিশ্চিন্ত হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবে না হয়তো। তবু এই রটনাই ভালো।' বলে চিন্তিত মুখে থেমে গেলেন জয়াপীড়।

কাশ্মীররাজের পরিকল্পনাটি অভিনব। মনে মনে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করলেন সেনাপতি দেবশর্মা। কিন্তু রাজা জয়াপীড়কে একাকী ছেড়ে দিতেও তাঁর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

কিছুক্ষণ শিবিরের মধ্যে পদচারণা করলেন অস্থিরচিত্ত জয়াপীড়। তারপর আবার এসে বসলেন সেনাপতির সামনে। তারপর থেমে

থেমে বলতে লাগলেন, 'তুমি কিন্তু প্রস্তুত থেকো দেবশর্মা, সদা সতর্ক থাকবে। তোমার সহায়তা ব্যতীত আমার শক্তি পরীক্ষা সফল হওয়া প্রায় অসম্ভব।' ভ্রূ কুঞ্চিত করে নীরব হলেন রাজা।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলে উঠলেন, 'তুমি সেনাবাহিনীকে জজ্জের প্রতি বিরূপ করে তুলবে। রাজবংশের প্রতি অনুগত সৈনিকদের বশীভূত রাখার চেষ্টা করে যাবে। অবশ্য—' কি ভেবে কথা শেষ করেন না জয়াপীড়। অন্যমনস্ক হয়ে উঠে পড়লেন আসন ছেড়ে। শিবিরের ক্ষুদ্র গবাক্ষের কাছে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন।

তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন দেবশর্মা।

'কাশ্মীরপতি, আপনি নীরব হলেন কেন ? কি বলতে চাইছিলেন ?' উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, সেনাপতি।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন জয়াপীড় বিনয়াদিত্য। তাঁর চোখে উদ্বেগ আর ব্যথার ছায়া।

—'কি বলবো দেবশর্মা। তোমাকে যে গুরুভার দিয়েছি তার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু সে অর্থ আজ আমার কোথায় ? আমার রাজকোষ জজ্জের হস্তগত। আমি ভাগ্যের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছি পথে পথে—।' আহত বেদনায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে কাশ্মীরনাথ বিনয়াদিত্যের।

'কাশ্মীরপতি', গাঢ় স্বরে বলে উঠলেন, দেবশর্মা। 'আপনার রাজকোষ বিশ্বাসঘাতক জজ্জের করতলগত, কিন্তু আমাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণও সামান্য নয়।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন রাজা, 'কি বলতে চাও সেনাপতি ?'

আবেগকম্পিত গলায় বলতে লাগলেন সেনাপতি, 'রাজা, পুরুষানুক্রমে আমরা থেকেছি কাশ্মীর রাজসিংহাসনের কাছাকাছি। মন্ত্রী অথবা সেনাপতিরূপে। রাজকোষ থেকে পাওয়া বেতন এবং অন্যান্য উপহার যা পেয়েছি আমরা—তার পরিমাণও কম নয়। সেই

অর্থ সঞ্চিত আছে আমাদের পূর্বপুরুষের—গ্রামের কুটিরে—গোপনে। সে অর্থের সন্ধান আমাদের বংশের বাইরে কেউ জানে না।'

বলতে বলতে নতজানু হয়ে বসে পড়েন দেবশর্মা, কাশ্মীরনাথের পায়ের কাছে। আবেগপূর্ণ গলায় যুক্তকরে বলে উঠলেন, 'কাশ্মীরনাথ, অনুগ্রহ করে অনুমতি দিলে, সে অর্থের আমি উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে পারি এখন—।'

'দেবশর্মা! সেনাপতি, বন্ধু—' বলতে বলতে দুহাতে দেবশর্মাকে তুলে ধরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কাশ্মীরপতি। তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে, কাশ্মীরপতি গাঢ় স্বরে বলে উঠলেন, 'ধন্য তুমি! ধন্য তোমার পিতৃপুরুষ! দেবশর্মা, তোমাদের সহৃদয় প্রভুভক্তিতে কাশ্মীরপতিও আজ নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করছে! বেশ, তাই হবে।'

'আরো একটি নিবেদন আছে, রাজা,—' নম্রকণ্ঠে বলেন সেনাপতি।

—'বলো'

—'রাজা, আমি আপনার কথামত কাশ্মীরে আমার অনুগত সেনানীদের প্রেরণ করবো। সেখানে আরো যেসব অনুগত সেনানায়কেরা আছেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে, সেনাবাহিনীকে গোপনে প্রস্তুত রাখার সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ রাখবো। তবে আমাকে কিছু সৈন্য নিয়ে প্রয়াগে এসে সতর্কতার সঙ্গে অপেক্ষা করার অনুমতি দিন, রাজন। আমি তাহলে আপনার কাছে কাছে থাকতে পারি—যে কোন মুহূর্তে প্রয়োজন হলেই দ্রুত যেতে পারি আপনার পাশে।'

অপলক দৃষ্টিতে অনুগত সেনানায়কের দিকে তাকিয়ে রইলেন, রাজা জয়াপীড়।

তারপর আবার তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন তিনি।

তাঁর চক্ষু সজল হয়ে এলো।

॥ ছয় ॥

পৌর্ণমাসির পুণ্য তিথি।

পুণ্যতিথির পুণ্য প্রভাতে ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে স্নান সারলেন রাজা জয়াপীড়। ইষ্টদেবতার অর্চনা করলেন তারপর। বিধিমত তর্পণাদি করে অশ্বদানে প্রবৃত্ত হলেন।

গঙ্গাতীরে—লোকে লোকারণ্য।

দানপ্রার্থী ব্রাহ্মণদের ভীড়। দর্শনার্থী উৎসুক জনতার ভীড়।

মাঝে-মাঝেই হর্ষধ্বনি করে উঠছিল জনতা।

রাজমন্দুরা থেকে অশ্বপালকেরা বারবার অশ্বগুলি নিয়ে আসছে।

একে একে জয়াপাড় ব্রাহ্মণদের দান করছেন সেগুলি, দক্ষিণাসহ।

দানপ্রার্থী ব্রাহ্মণদের মধ্যে নদীতীরের সেই স্নানার্থী ব্রাহ্মণও ছিলেন।

রাজবেশধারী জয়াপীড় বিনযাদিত্যের দান গ্রহণ করার সময় সেই গণনাকারী ব্রাহ্মণ কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে দেখলেন রাজাকে। তাঁর চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেলো।

জয়াপাড়ও তাঁকে চিনেছিলেন। সকৌতুকে দক্ষিণা দিয়ে বিদায় দিলেন ব্রাহ্মণকে।

বিস্ময়বিহ্বল চোখে রাজাকে দেখতে দেখতে ব্রাহ্মণ দ্রুত পায়ে হারিয়ে গেলেন জনতার মধ্যে।

লক্ষ অশ্বদান শেষ হলো। রাজশিবিরে ফিরলেন জয়াপীড়।

তাঁকে ক্লান্ত কিন্তু হর্ষোৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

তাঁর লক্ষ অশ্বের মন্দুরা আজ শূন্য। রয়ে গেছে কেবলমাত্র একটি অশ্ব। তাঁর প্রিয় অশ্বটি।

'এখন কি করবেন, মহারাজ?' প্রশ্ন করলেন সেনাপতি।

—'এবার আমি বেরিয়ে পড়বো পূর্ব দেশের অভিমুখে, ভাগ্য পরীক্ষায়। শোন, দেবশর্মা! আমার নাম—আমার নতুন নাম—'

কণ্ঠস্বর নামিয়ে দেবশর্মার কানে কানে একটি নাম উচ্চারণ করলেন, জয়াপীড়।

'মনে রেখো এই নামটি। এবার আমি ছদ্মবেশ নেবো। বণিকের ছদ্মবেশ। রত্নব্যবসায়ী বণিক। কয়েকটি রত্ন আমাকে দিও। পাথেয় স্বরূপ দিও কিছু স্বর্ণমুদ্রা।' লঘু প্রসন্নতার সুরে বলে উঠলেন, জয়াপীড়।

মাথা নত করে বসেছিলেন দেবশর্মা।

'দেবশর্মা!' গভীর স্বরে ডাক দিলেন রাজা জয়াপীড়। 'দেবশর্মা, অকারণে মনোকষ্ট পাচ্ছো কেন বন্ধু? বরং মার্তণ্ডদেবের কাছে প্রার্থনা করো—যেন এবার আমি ব্যর্থ না হই। কাশ্মীর রাজবংশের উপাস্য দেবতা মার্তণ্ডদেবের অনুগ্রহে, পিতৃপুরুষের আশীর্বাদে, তোমাদের সকলের শুভেচ্ছায়, আমি যেন সফলকাম হতে পারি।'

দেবশর্মার একটি হাত ধরে, গাঢ় স্বরে বলে চললেন রাজা, 'সতর্ক থেকো, প্রস্তুত থেকো, বন্ধু। সঙ্কেত পাওয়া মাত্র যোগ দেবে আমার সঙ্গে। গূঢ় পুরুষ মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রেখো।'

—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন দেব বিনয়াদিত্য। আমি সজাগ এবং সতর্ক থাকবো। কাশ্মীরের ব্যবস্থা দ্রুত সম্পাদন করে ফেলবো আমি। এদিকে প্রয়াগে বসে আপনার প্রতীক্ষায় থাকবো।'

আর কথা বলতে পারেন না তরুণ সেনাপতি। আসন্ন বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করে তাঁর গলা বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। 'যে মুহূর্তে সঙ্কেত পাবো, ছুটে যাবো আপনার কাছে।'

সেনাপতি এই কটি কথা নিবিড়ভাবে উচ্চারণ করলে, তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন তরুণ নরপতি।

সেই রাত্রেই ছদ্মবেশে রাজশিবির ত্যাগ করলেন রাজা জয়াপীড়। তাঁর নির্দেশে অশ্বটিকে প্রস্তুত রেখেছিলেন সেনাপতি দেবশর্মা।

গভীর রাত। নির্জন পথ।

পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে চারধার উজ্জ্বল।

পথে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে রাজা প্রণাম জানালেন ইষ্টদেবতাকে।

ভাগ্য এখন কোন পথে তাঁকে পরিচালিত করবে, কে জানে!

জ্যোৎস্নালোকে পথ চিনে চিনে অশ্বপৃষ্ঠে এগিয়ে চললেন কাশ্মীরপতি। সঙ্গীহীন—একাকী!

॥ সাত ॥

শঙ্কর কর্মকার তার কর্মশালায় বসে বসে হাপর টানছিল।

তুখানি তরবারি অতি শীঘ্র তৈরী করে দিতে হবে তাকে।

পুণ্ড্রবর্ধনের পুরপালের আদেশ।

তুখানি তীক্ষ্ণধার অসি তাঁর চাই। বৈবাহিককে উপহার দেবেন তিনি।

গৌড়দেশের লৌহশিল্প ভারতবিখ্যাত।

প্রতিবেশী রাজ্যের বণিক অথবা রাজপুরুষেরা এসেও গৌড়ীয় কর্মকারদের তীক্ষ্ণফলা অসি আর বর্শাফলক কিনে নিয়ে যায়।

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে লৌহফলকগুলো টেনে বার করে শঙ্কর। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে লৌহফলার জ্বলন্ত রক্তিমার দিকে।

কর্মশালার দ্বারপ্রান্তে কার ছায়া পড়লো। শঙ্কর মুখ তুলে দেখলো।

দ্বারপ্রান্তে দেখা দিয়েছে—এক পুরুষ মূর্তি। ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত শরীর।

কর্মকারকে দেখে পুরুষটি বলে উঠলো, 'জল, আমাকে জলপান করাতে পারো? আমি বড় তৃষ্ণার্ত।'

হাতের কাজ থামিয়ে বার তুই আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো শঙ্কর কর্মকার। তারপর উঠে গিয়ে কর্মশালার কোণে রাখা মৃৎকলস থেকে মৃৎপাত্রে জল গড়িয়ে নিয়ে এলো।

—'ধর, জলপান করো।'

জলপাত্রটি নিয়ে জলপান করতে গেলো আগন্তুক। তাকে বাধা দিলো শঙ্কর।

'একটু অপেক্ষা করো। তোমাকে ক্ষুধার্ত বলে মনে হচ্ছে। শুধু জলপান করো না।' এই বলে, কর্মশালা থেকে গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলো কর্মকার।

আগন্তুক যুবা বসে বসে কর্মশালাটি দেখতে লাগলো।

বাঁশের খুঁটি। মাটির প্রাচীর। কর্মশালার ছাদটি পোড়ামাটির হাল্‌কা চতুষ্কোণ খণ্ড দিয়ে দিয়ে নির্মিত। গৃহতলও মাটির।

গৃহতলের মাটির মধ্যে অগ্নিকুণ্ড। কুণ্ডের পাশে দুটি জ্বলন্ত লৌহ-ফলক।

কর্মকার গৃহের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। তার হাতে কদলিপত্রে কিছুটা শুকনো ক্ষীর ও গুড়।

—'এইটি মুখে দিয়ে জলপান করো।'

গুড় ও ক্ষীর মুখে দিয়ে জলপান করলো আগন্তুক। সেই অবসরে শঙ্কর কর্মকার তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিল।

আগন্তুক যুবকের দীর্ঘদেহ। গৌরবর্ণ। চক্ষুতারকা ঈষৎ নীলাভ।

পরনে মূল্যবান পরিচ্ছদ। কানে রত্নকুণ্ডল, গলায় মুক্তার হার। জড়োয়া কণ্ঠি। মাথায় উষ্ণীষ। কটিবন্ধে তরবারি। আগন্তুক কোন বিদেশী রাজপুরুষ অথবা সম্ভ্রান্ত বংশীয় কোন পুরুষ।

জলপান করে জলপাত্রটি কর্মকারের হাতে দিয়ে পরিতৃপ্তির শ্বাস ফেলে আগন্তুক।

'তুমি বিদেশী?' শঙ্কর প্রশ্ন করে।

—'হ্যাঁ', মাথা নাড়লো, বিদেশী যুবক।

—'কোথা থেকে আসছো?'

'বারাণসী থেকে।' সামান্য দ্বিধা করে উত্তর দেয় যুবক।

—'তুমি কি কোন রাজপুরুষ? অথবা বণিক?' শঙ্কর কর্মকার একটু বেশি কৌতূহলী। কথা বলতে সে ভালোবাসে।

'হ্যাঁ, আমি বণিক।' সতর্কভাবে উত্তর দেয়, বিদেশী যুবা।

'তোমার সঙ্গীরা কোথায়?' সন্দিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করে শঙ্কর বললো, 'বারাণসী থেকে আসছো বলছো। এতটা পথ! বণিকেরা তো দলবদ্ধ হয়ে ঘোরে। পথে দস্যু তস্করের ভয় আছে। তোমাকে তো একলা দেখছি!'

কর্মকারের কৌতুহল দেখে বিরক্ত বা বিব্রত হলো না বিদেশী আগন্তুক। বরং বেশ সপ্রতিভই মনে হলো তাকে।

সে দেখলো কর্মকারের বয়স বেশি নয়। শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠদেহী যুবক। কুঞ্চিত কেশদাম কাঁধে এসে পড়েছে। সুপুষ্ট গুম্ফ কর্মকারের সুকুমার মুখে একটা মধুর গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে। তার ঊর্ধাঙ্গে কোন আবরণ নেই। খাটো বস্ত্র আঁটসাট করে পরা। গলায় রূপার সূত্রে সুবর্ণ তাবিজ।

কর্মকারও একইভাবে তাকিয়েছিল আগন্তুকের মুখের দিকে।

চোখে চোখ পড়তে হাসলো আগন্তুক।

—'বন্ধু, আমার সর্বস্ব অপহরণ হয়ে গেছে চম্পার গঙ্গাতীরে।'

শান্ত গলায় বলে উঠলো সে, 'আমার সঙ্গীদল এগিয়ে গেছে। আমি আমার রত্নগুলি আর সুবর্ণমুদ্রার অনুসন্ধানে পিছিয়ে পড়েছিলাম।'

বিদেশীর বন্ধু সম্বোধনে প্রীত হলো কর্মকার। কিন্তু তার সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হয় নি।

—'তস্করে তোমার সর্বস্ব অপহরণ করলো? তুমি তখন কি করছিলে?'

'আমি তখন গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলাম।' ধীর গলায় বলে বিদেশী।

—'তুমি তাহলে এখন কি করবে?'

'আমি এখন সহায়-সম্বলহীন বিদেশী। চলেছি পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর দিকে, উদ্দেশ্য—ভাগ্য অন্বেষণ।' বিষণ্ণ হাসি হেসে যুবক বলে।

'দেখি কি হয়।' বলে, উঠে দাঁড়ায় সে।

'দাঁড়াও,' শঙ্কর বলে ওঠে। রূপবান সম্ভ্রান্ত আগন্তুকের আচরণ তাকে মুগ্ধ করেছে। এমন একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আছে এ বিদেশীর মধ্যে।

—'দাঁড়াও। বিদেশী, তুমি বলছো, তুমি নিঃসম্বল। তস্করে তোমার সর্বস্ব অপসরণ করেছে। তোমার পাথেয় কি আছে?'

'কিছু না।' বিচিত্র ভ্রূ ভঙ্গি করে বিদেশী উত্তর দেয়।

'তাহলে তোমার চলছে কি করে?' কর্মকার যেন নিজের মনেই বলে ওঠে। চোখ কুঞ্চিত করে তাকিয়ে থাকে আগন্তুকের দিকে।

শেষে অনুকম্পায় প্লাবিত হয় কর্মকারের হৃদয়। সদয় কণ্ঠে আগন্তুককে বললো, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে—তুমি খুবই ক্ষুধার্ত। এখন বেলা দ্বিপ্রহর হতে চলেছে। এসো, তোমার ভোজনের ব্যবস্থা করি।'

বিদেশী আগন্তুকের দৃষ্টি কৃতজ্ঞতায় কোমল হয়ে আসে। সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে তরুণ কর্মকারের দিকে। তার ভঙ্গিতে সামান্য দ্বিধা।

তার দিকে তাকিয়ে হাসলো শঙ্কর কর্মকার। তার সগুম্ফ মুখের কোমল হাসিটিও বড় মধুর।

—'বিদেশী, পুণ্ড্রবর্ধন নগরী এখনো তিনদিনের পথ। কি ভাবছ এত? অ্যাঁ?'

সামান্য ধমকের স্বরে সে বলে ওঠে, 'তুমি কি অনাহারে পথের মধ্যেই মরতে চাও? এসো, এসো আমার সঙ্গে। আমার কুটিরের ভিতরে চলো। এসো, এত সঙ্কোচ কিসের?'

কর্মশালার ভিতর দিয়ে দুজনে এগোলো কুটির অভ্যন্তরে। কয়েক পা এগিয়ে থেমে গেলো কর্মকার।

ঘাড় ফিরিয়ে বলে উঠলো 'দেখো, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে—

তুমি সম্ভ্রান্ত বংশের পুরুষ। তোমার উপযুক্ত খাদ্য পানীয় কিছুই পাবে না এখানে। তবে গৌড়বাসী অতিথিসৎকার করাকে পুণ্য কাজ বলে মনে করে। অতিথিসৎকার গৃহস্থের ধর্ম। চলো, আমার কুটিরে সামান্য অন্নব্যঞ্জন মুখে দেবে।'

কর্মশালা ছেড়ে ভিতরে যাবার ক্ষুদ্র দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কর্মকার হাসিমুখে বলে ওঠে, 'আমার নাম শঙ্কর। শঙ্কর কর্মকার। এ কর্মশালা আমাদের তিনপুরুষের। তোমাকে কি বলে ডাকবো?'

—'বন্ধু। বন্ধু বলেই ডেকো আমায়।' বিদেশী যুবকও নরম হাসি হাসে। 'আজ থেকে তুমি আমার মিতা।'

॥ আট ॥

গৌড়বাসী মিতার অতিথিসৎকারের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলো বিদেশী।

এর আগে অনেক জায়গায় ঘুরেছে সে, অনেক ভাবে আপ্যায়িত হয়েছে। কিন্তু আজ সাধারণ এক গৃহস্থ কুটিরের আন্তরিক যত্ন আর প্রীতিভরা অভ্যর্থনায় তার মন ভরে গেলো।

কর্মকারের সংসারটি বেশ ছোট।

বৃদ্ধা জননী, তরুণী স্ত্রী আর আর এক বৎসরের শিশু পুত্র।

কর্মশালার পিছনে দুটি মাটির কুটির। খড়ে ছাওয়া, বাঁশের খুঁটি। ঘরের প্রাচীরে গোময় ও মাটির প্রলেপ। সাদা আলিম্পনরেখায় উজ্জ্বল।

প্রশস্ত অঙ্গন। কুটির ও অঙ্গনের চার পাশে বাঁশের বেষ্টনী।

অঙ্গনের দু'পাশে ফুলের গাছ। বাঁশের বেষ্টনীতেও লতা।

অঙ্গনের বাতাস পুষ্প-সুবাসে মন্থর।

অঙ্গনে মাটির খেলনা নিয়ে খেলা করছিল কর্মকারের শিশুপুত্রটি।

শ্যামবর্ণ হৃষ্টপুষ্ট শিশু। মাথার ঘন কুঞ্চিত চুল চূড়া করে বাঁধা।

তাতে রূপার অলঙ্কার। শিশুর হাতে কোমরে আর পায়েও রূপার অলঙ্কার। গলায় রূপার সূত্রে ঝুলছে চতুষ্কোণ ফলক।

আঙ্গিনায় পা রেখে শঙ্কর উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলো, 'কোথায় গেলে গো? দেখ, আমার বিদেশী মিতা এসেছে। মিতা বড়ই ক্ষুধার্ত। ওকে চারটি অন্নব্যঞ্জন দাও।'

একটি কুটিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এক অবগুণ্ঠনবতী যুবতী। তার পরনে নীলবর্ণের উপর সাদা রেখা টানা বস্ত্র। একহাতে অবগুণ্ঠন সামান্য সরিয়ে স্বামীর অতিথির দিকে তাকিয়ে হাসলো যুবতী। তার গভীর কালো চোখে কৌতুক ও বিস্ময় নৃত্য করছে। হাসির সঙ্গে তার কুন্দ দন্তের ঝিলিক চোখে পড়লো আগন্তুকের।

কুটিরের বাইরে একটি তালপত্রের আসন বিছিয়ে দিলো বধূ। পাশে রাখলো জলপূর্ণ একটি পাত্র।

শঙ্কর বললো, 'এসো মিতা। তোমার হাত পা ধুয়ে নাও।'

অপর কুটিরের দ্বারপ্রান্তে বসেছিল এক বৃদ্ধা। তার মাথার সব চুল সাদা। পরনের বস্ত্রখানিও সাদা।

শঙ্কর সেই দিকে দেখিয়ে বললো, 'আমার মা। আমার পিতা আজ দশ বৎসর হল গত হয়েছেন। কর্মকার হিসাবে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল, বুঝলে মিতা। তাঁর তৈরি তীক্ষ্ণধার তরবারির খ্যাতি দূর-দূরান্তেও ছড়িয়ে পড়েছিল।'

বলে হাসলো সে। তারপর সগর্বে বললো, 'গৌড়ের কর্মকারদের লৌহ-অস্ত্রের প্রসিদ্ধি অনেক দিনের, জান হে মিতা! আমিও দুটি তরবারি তৈরি করছি পুণ্ড্রবর্ধনের পুরপালের জন্য। দেখাবো তোমায়।'

এই অবসরে শঙ্করের পত্নী অতিথি আর গৃহকর্তার জন্য অন্ন নিয়ে এলো।

কুটিরের বাইরে অতিথির পাশে শঙ্করের জন্যও একটি তালপত্রের আসন বিছিয়ে দিলো। আসনের সামনে জল ছিটিয়ে পেতে দিলো দুটি কদলিপত্র।

রন্ধনশালা থেকে নিয়ে এলো অন্নব্যঞ্জন। কদলিপত্রের উপর ঢেলে দিলো স্তূপীকৃত অন্ন। তার উপরে ঢেলে দিলো গব্য ঘৃত।

শঙ্করও এর মধ্যে হতে পা ধুয়ে এসে বসলো বিদেশী অতিথির পাশের আসনটিতে।

পরম পরিতুষ্ট মনে অন্নের গ্রাস মুখে তুলতে লাগলো বিদেশী যুবক।

কর্মকারবধূ নিয়ে এলো আরো অন্ন এবং ব্যঞ্জনের পদ। শাক ভাজা, অলাবুর ব্যঞ্জন, সরিষা সহযোগে মৌরলা মাছ।

কর্মকারপত্নীর গাত্রবর্ণ নব দুর্বাদলের মতো কোমল শ্যাম। শঙ্খ বলয় আর রূপার বালা পরা দুটি শ্যামল হাতে অন্ন পরিবেশন করলো সে।

ভোজনের শেষে কর্মকার বধূ এনেছিল দুটি দুধের পাত্র।

'আমার কপিলা গাইয়ের দুধ।' হাসিমুখে বললো শঙ্কর। 'দুটি অন্ন দিয়ে গুড় মেখে খাও। ভালো লাগবে। গৌড়ের গুড় প্রসিদ্ধ।'

আহারের পর হাত মুখ ধুয়ে কুটিরের ভিতরে বসলো দুজন।

বধূ তাম্বুল এনে দিলো।

বিদেশী প্রসন্ন কণ্ঠে বলে উঠলো, 'মিতা, আমার মিতানীকে বলো, রন্ধন অতি উত্তম।'

অবগুণ্ঠনের ফাঁকে গভীর কালো চোখদুটি আবার কৌতুকে নেচে উঠলো। দেখা দিলো কুন্দ দন্তের ঝিলিক।

—'মিতা। তোমার কর্মশালার সামনে আমার অশ্বটি বাঁধা আছে। তার জন্য-- ।'

'দেওয়া হয়েছে। ঘাস আর জল।' পরিতৃপ্ত গলায় বলে উঠলো শঙ্কর। 'তোমার মিতানী বড়ই পাকা গৃহিনী, ওর দৃষ্টি সবদিকেই আছে।' বলতে বলতে শঙ্কর কটাক্ষ করলো পত্নীকে।

মিতা মিতানীর সহজ দাম্পত্য প্রীতির সরল প্রকাশে প্রসন্ন হলো বিদেশী।

॥ নয় ॥

সেদিন রাত্রে কুটিরের বাইরে শুয়েছিল শঙ্কর কর্মকার আর বিদেশী অতিথি।

কর্মকার গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তার নাসিকা গর্জন করছে।

কর্মকার আজ বেশিমাত্রায় মদ্যপান করে ফেলেছে।

সন্ধ্যার সময় কর্মশালার ভিতরে বিদেশী মিতার জন্য অন্ন ও গুড় সহযোগে যে গৌড়ী মদিরা—প্রস্তুত হয়—সেই মদিরা নিয়ে এসেছিল কর্মকার। শৌণ্ডিকালয় থেকে। কর্মকারবধূ তার আদেশে ভাজলো রোহিত মৎস্য। ঝাল মশলা সহযোগে। ভাজা রোহিত মৎস্য খণ্ড আর সেই মদিরা আকণ্ঠ পান করেছিল কর্মকার।

তার মন বড়ই প্রফুল্ল। বিদেশীও পান করেছিল।

এ মদিরার স্বাদও উপভোগ করেছিল। কিন্তু পান করে মত্ত হবার মতো মনের অবস্থা তার নয়। পরিমিত মাত্রায় পান করেছিল সে। তার, কর্মকার মিতার অনুরোধে।

গ্রীষ্মের রাত্রি।

মিতানী একটি তালপত্রের ব্যজনী রেখে গেছে। সেইটি তুলে নিয়ে ব্যজন করতে লাগলো বিদেশী।

নিজে এমন করে ব্যজনী ধরেছে কখনও? কে জানে? মনে পড়ে না।

শঙ্কর কর্মকার লোকটি বড় ভালো।

সস্নেহে বিদেশী তাকায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন কর্মকারের দিকে।

কর্মকার আজ তাকে কিছুতেই ছাড়ে নি।

তার কুটিরে সেই রাতটিও আতিথ্য নেবার জন্য বার বার অনুরোধ করায়—অগত্যা স্বীকৃত হয়েছিল সে।

বিদেশী মিতার সঙ্গে সন্ধ্যাটি উপভোগ করার জন্য কর্মকার ছুটেছিলো শৌণ্ডিকালয়ে ।

সত্য কি বিচিত্র এই জগৎ !

অচেনা অজানা এই গৌড়বাসী। কত সমাদরে ঘরের মাঝে স্থান দিয়েছে—তার সর্বস্ব অপহৃত হয়েছে শুনে।

অথচ নিজের আত্মায়, বন্ধু ? তারা ?

লোভে উন্মত্ত হয়ে অন্যায়ভাবে অধিকার করেছে তার সব কিছু।

আর ভাবতে পারে না বিদেশী।

জোরে জোরে ব্যজন করতে থাকে।

পুণ্ড্রবর্ধন নগর। আরো তিনদিনের পথ।

কিন্তু সে নগরীতে উপস্থিত হয়েই বা কি করবে সে ?

কি ভাবে দেবে আত্মপরিচয় ? কার কাছে যাবে সে ?

তবু অকারণ কালক্ষেপ করে লাভ কি ?

আগামীকালই সে যাত্রা করবে পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর উদ্দেশে।

পাথেয় বলতে তো কিছুই আর নেই।

তবু আর বিলম্ব করবে না সে।

তস্করে তার সর্বস্ব অপহরণ করলেও অঙ্গের অলঙ্কারগুলি তো এখনো আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিদেশী চক্ষু মুদিত করে। নিদ্রার প্রয়োজন।

এখনও অনেক পথ বাকি।

॥ দশ ॥

পরদিন প্রত্যূষে ঘুম ভাঙলো তার।

কর্মকারের ঘুম ভেঙ্গেছে। তার শয্যা শূন্য।

চক্ষু মেলে চারধার ভাল করে নিরীক্ষণ করলো সে।

কর্মকারবধূ সম্মার্জনী দিয়ে অঙ্গন পরিষ্কার করছে।

মাথায় তার দীর্ঘ অবগুণ্ঠন।

অবগুণ্ঠের ফাঁকে দীর্ঘ কালো চুল কাঁধের উপর ছড়ানো।

বধূর পরণে রাঙা বস্ত্রটি—প্রভাতসূর্যের মতোই অরুণ বর্ণ।

প্রাঙ্গণ পরিষ্কৃত হলে—ফুলগাছগুলিতে সে জল সেচন করতে লাগলো।

তাদের শিশুপুত্রটি মায়ের পিছন পিছন চলছে—অসমান পদক্ষেপে। মায়ের বস্ত্রাঞ্চল ধরে খেলা করতে চাইছে।

প্রভাতেই এমন একটি মধুর গার্হস্থ্য ছবি দেখে বিদেশী যুবকের মন প্রসন্ন হয়ে গেলো!

স্মিত মুখে সে তাকিয়ে দেখছিল মাতাপুত্রকে।

জল সেচন করতে করতেই এক হাতে অবগুণ্ঠন সরিয়ে বিদেশীর দিকে দৃষ্টিপাত করলো কর্মকারবধূ।

অতিথির নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে কিনা তাই সম্ভবতঃ দেখতে চেয়েছিল।

বিদেশী অতিথিকে জাগ্রত দেখে সলজ্জ ভঙ্গিতে দ্রুত পায়ে সে চলে গেলো অঙ্গনপ্রান্তে কর্মশালার দিকে।

কর্মকারকে ডাকতে গেলো সম্ভবতঃ।

কর্মশালা থেকে বেরিয়ে এলো শঙ্কর।

সদ্য স্নাত। সগুম্ফ মুখে সরল হাসি।

—'মিতার ঘুম ভেঙেছে? চলো, কুটিরের পিছনেই পুষ্করিণীতে স্নান সেরে নাও।'

স্নানাদি সেরে ফিরে এলো বিদেশী যুবক।

সে দেখলো কুটিরের সামনে কদলিপত্রে আহার্য সাজিয়ে রেখেছে কর্মকারপত্নী।

শঙ্কর তার জন্য অপেক্ষা করছে।

দুজনে আহারে প্রবৃত্ত হলো।

তালপত্রের ব্যজনী নিয়ে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে বধ্ এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে।

'বন্ধু, এবার আমায় বিদায় দাও।' আহার শেষ হলে, বললো বিদেশী।

'সেকি মিতা! তুমি আরো দু' একদিন আমার কুটিরে থাকবে না? অবশ্য তুমি অভিজাত বংশের মানী পুরুষ। আমার মতো সামান্য এক কর্মকারের কুটিরে বাস করা তোমার পক্ষে কষ্টকর।' শঙ্কর ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বলে ওঠে।

'না, মিতা, তুমি অসময়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছো, আহার দিয়েছো। তোমার ঋণ আমার চিরকাল মনে থাকবে। এখন আমায় বিদায় দাও।'

'দ্বিপ্রহরে আহার করেই যেও না হয়', শঙ্কর আবার অনুরোধ করে।

বিদেশীর চোখে পড়লো—অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে দুটি কালো চোখেও সেই এক মিনতি।

কিন্তু বৃথা কালক্ষেপ করে লাভ কি?

—'না মিতা! আমাকে অনুরোধ করো না। আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছাতে হবে রাজধানীতে। তুমিই তো বলছো—আরো তিন দিনের পথ'।

—'তা বটে! তবে তোমার অশ্বটি ভালো জাতের। ঐ অশ্বপৃষ্ঠে এক রাত্রি আর দু' দিন লাগবে তোমার।'

কথা বলতে বলতে বিদেশী যুবক আর শঙ্কর দুজনে কুটিরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

সামনের একটি বৃক্ষমূলে বাঁধা অশ্বটি প্রভুকে দেখে হ্রেষাধ্বনি করলো।

নিজের গলা থেকে রত্নময় কণ্ঠিটি খুলে নেয় বিদেশী। আঙুল থেকে খুলে নেয় একটি রত্নাঙ্গুরী।

—'মিতা, তুমি আমার অনেক করেছো। এই ধর আমার কণ্ঠি—মিতানীকে বাজুবন্ধ গড়িয়ে দিও।'

বিদেশী অতিথি কর্মকারের হাতে গুঁজে দিতে যায় আভরণখানি।

—'আর এই নাও, এই অঙ্গুরীটি দিও তোমার পুত্রকে।'

'না, না মিতা, তুমি এসব কি করছো?' প্রবল আপত্তি জানিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে যায় কর্মকার। আহত স্বরে সে বলে ওঠে, 'তুমি ধনী, উচ্চ বংশের সন্তান, সে তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়। এক রাত্রি আমার কুটিরে থেকে ধন্য করেছো আমাকে। তাই বলে এসব কি দিতে যাচ্ছ?'

এরপরে দুটি হাত জুড়ে সে বলে ওঠে, 'আমি সামান্য কর্মকার, ও সব আমার কিছুই চাই না।'

দু' হাতে কর্মকারের দুটি হাত ধরলো বিদেশী যুবক। তার নীলাভ চক্ষুতারকায় বিষাদের ছায়া ঘনালো।

'মিতা, তুমি অসময়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছো। আমি তো তোমাকে কিছুই দিই নি। তুমিই আমাকে ঋণী করে রাখলে। এ তো মিতানী আর পুত্রটির জন্য আমার সামান্য উপহার।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো বিদেশী।

অগত্যা নিবৃত্ত হলো কর্মকার। তার সরল শ্যামল মুখেও বিষাদের ছায়া। ব্যগ্র কণ্ঠে সে বলে উঠলো, 'কিন্তু মিতা, কথা দাও, পুণ্ড্রবর্ধন থেকে ফেরার পথে আবার আসবে আমার কুটিরে।'

বলতে বলতে বৃক্ষমূল থেকে বিদেশীর অশ্বটিকে খুলে নিয়ে এলো সে।

শঙ্করের পিঠে একটি হাত রাখলো বিদেশী।

শঙ্কর বলে উঠলো, 'তোমার জন্যও একখানি তরবারি প্রস্তুত করে রাখবো, নিয়ে যেও কিন্তু।'

অশ্বের মসৃণ পৃষ্ঠে দুটি স্নেহ চপেটাঘাত করে অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসলো বিদেশী যুবক। হাসিমুখে বললো, 'প্রত্যাবর্তনের সময় নিশ্চয় আসবো তোমার কুটিরে। নিয়ে যাবো আমার তরবারি।'

কর্মশালার দ্বারে এসে দাঁড়ালো কর্মকারপত্নী। কোলে শিশুপুত্র। তার মাথার অবগুণ্ঠন খসে পড়েছে।

সে ইঙ্গিতে বিদেশী অতিথিকে থামতে বললো। অঞ্চলপ্রান্ত থেকে একটি বস্ত্রাচ্ছাদিত পুঁটলি বার করে অনুচ্চ কণ্ঠে স্বামীকে কি বললো।

—'ওহে মিতা। এই নাও, তোমার মিতানী পথে খাবার জন্য আহার্য দিয়েছে তোমাকে।' শঙ্কর ছুটে এলো বিদেশীর কাছে।

সকৃতজ্ঞ চোখে কর্মকারপত্নীর দিকে তাকালো বিদেশী।

শ্যামাঙ্গী তরুণী। কপালে কাজলের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর। দুটি কালো চোখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি।

দু' হাতে অঞ্জলি পেতে বস্ত্রাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র পুঁটলিটি গ্রহণ করলো বিদেশী যুবক।

—'পুণ্ড্রবর্ধন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মিতানীর দেওয়া এমন একটি পুলিন্দাও নিয়ে যাবো কিন্তু—আর আমার তরবারি।'

কর্মকারের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলে উঠলো সে।

প্রভুর ইঙ্গিতে শিক্ষিত অশ্ব দ্রুতবেগে ছুটে চললো রাজপথ ধরে।

অপস্রিয়মান অশ্বারোহীর দিকে তাকিয়ে রইলো শঙ্কর কর্মকার। প্রায় সমবয়সী বিদেশী যুবক তার মনোহরণ করেছে। একরাত্রেই যেন কত কালের প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠেছে সে।

কর্মকারপত্নীও সেইসঙ্গে তাকিয়ে রইলো অপস্রিয়মান অতিথির দিকে।

স্খলিত অবগুণ্ঠন মাথায় তুলে দেবার কথা মনে রইলো না তার। বিদেশী অতিথি তাদের সকলের মনোহরণ করে চলে গেলো।

॥ এগারো ॥

প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চলেছে বিদেশী।

রাজপথের দুপাশে তালবৃক্ষ, বট, অথবা অশ্বত্থ।

নিম বা আম্রবৃক্ষেরও অভাব নেই।

ছায়া সুশীতল পথ। মাঝে মাঝেই নির্মল জলের পুষ্করিণী।

রাজপথ চলে গেছে সোজা রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধনের দিকে।

প্রভাতসূর্য—তখন মধ্য গগন পার হয়ে গেছে।

অনেকটা পথ অতিক্রম করে অশ্ব কিছুটা ক্লান্ত।

অশ্বারোহীও ক্লান্ত। ঘর্মাক্ত। ক্ষুধার্ত।

একটি পুষ্করিণীর পাশে বটবৃক্ষের নীচে অশ্ব থামালো সে।

অশ্ব থেকে অবতরণ করে হাত মুখ ধুয়ে বৃক্ষছায়ায় বসলো বিদেশী। কর্মকারবধূর দেওয়া আহার্যের পুঁটলিটি খুললো সে।

কদলিপত্রে অনেকগুলি পিষ্টক আর মিষ্টান্ন। শুকনো ক্ষীর।

সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে করতে স্বল্পপরিচিত গৌড়ীয় গ্রাম্য-বধূর মমতার কথা ভেবে তার চক্ষু দুটি কৃতজ্ঞতায় সজল হয়ে এলো।

আরো দণ্ড দুই বিশ্রামের পর আবার অশ্বপৃষ্ঠে উঠলো বিদেশী।

সূর্য তখন পশ্চিম গগনের দিকে চলেছে।

বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর একটি গ্রাম পার হয়ে গেলো বিদেশী।

আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে সে দেখতে পেলো একদল গৌড়বালা আসছে বিপরীত দিক থেকে।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দেখতে লাগলো বিদেশী।

নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে পল্লীরমণীরা অশ্বারোহীকে অতিক্রম করে গেলো।

কেউ কেউ কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখলো অশ্বারোহীর দিকে, কিন্তু তাদের গতি মন্থর হলো না। চলতে চলতেই করাঙ্গুলিতে হিসাব

করছিল তারা। চলার বেগে কাঁধের আঁচল স্খলিত হয়ে পড়ছে। যথাস্থানে আঁচলটি তুলে আবার চলেছে তারা।

পল্লীবাসিনীরা প্রায় সকলেই শ্যামাঙ্গী।

তরুণী প্রৌঢ়া সব—বয়সের মেয়েরাই রয়েছে।

তরুণীদের কপালে কাজলের টিপ, কানে রীঠাফুলের আভরণ, হাতে পদ্মমৃণালের বালা।

কারো মাথায় বেতের পেটিকা, কারো বা কক্ষে।

পল্লীর হাট থেকে বেচাকেনা সেরে ঘরে ফিরছে তারা।

পথে আরো দুচার জন পথিক ছিল।

কোমলাঙ্গী পল্লীবধূ আর বালিকাদের দেখে তাদের গতি স্বভাবতই মন্থর হয়ে পড়ছিল।

তরুণীরাও বক্র কটাক্ষে দেখছিল তাদের।

প্রবীণারা পথ চলতে চলতেই সতর্ক করে দিচ্ছিল তাদের।

—'ওদিকে তাকিয়ো না। তোমাদের আচরণে বিন্দুমাত্র চাপল্য দেখা গেলে গ্রামপ্রধান ডাকিনী বলে এখনই তোমাদের দণ্ড দেবে। চলো, চলো, এগিয়ে চলো, বাছারা।'

সূর্যাস্ত হতে তখনও দণ্ডখানেক বাকি।

বিদেশী পথিক একটি সার্থবাহ দলের দেখা পেলো।

গোযানে করে পণ্যাদি নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে পুণ্ড্রবর্ধনের পথে।

সার্থবাহের দলনেতার সঙ্গে পরিচয় হলো বিদেশীর।

তারা আসছে কজঙ্গল থেকে।

বিদেশী তাদের সঙ্গী হতে চাইলে সম্মতি দিলো সার্থবাহপতি।

সঙ্গীদল পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো বিদেশী।

সার্থবাহপতি চলেছে একটি অশ্বপৃষ্ঠে। তারই পাশেপাশে অশ্বচালনা করতে করতে আলাপ পরিচয় করতে থাকে বিদেশী।

—'বণিক, আপনাদের দেশ কোথায়?'

'আমরা আসছি গুর্জর দেশ থেকে।' উত্তর দিলো প্রবীণ বণিক।

তার মাথায় উজ্জ্বল ইন্দ্রলুপ্ত। চারপাশে শুভ্র কেশের পরিমণ্ডল। গৌরবর্ণ। নাতিদীর্ঘ চেহারা। মধ্যদেশ স্থূল। চোখের দৃষ্টি সতর্ক।

দীর্ঘদিন যারা বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে, বহু লোকের সঙ্গে অর্থ-বিনিময় করে, পদে পদে যাদের প্রাণের ভয়— তাদের বোধ হয় এমনই দৃষ্টি হয়, এই কথা ভাবলো বিদেশী।

—'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

—'আমি? বারাণসী থেকে। চলেছি পুণ্ড্রবর্ধনে। রাজ কার্যে।'

—'একাকী এই দীর্ঘ পথ এসেছেন?'

—'না, সঙ্গীদল এগিয়ে গেছে।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার চেষ্টা করে বিদেশী।

—'আপনাদের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের কথা বলুন। গৌড়ে চলেছেন কি কি বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে?'

—'বারাণসী থেকে মহার্ঘ বস্ত্রসম্ভার এনেছি। গুর্জরী মুক্তা আর শঙ্খ। গৌড় দেশ থেকে ঐ সব বস্তুর বিনিময়ে নিয়ে নেবো গুবাক, পান, নারিকেল। আর আমরা নেবো মহার্ঘ রেশমী দুকুল, আর পত্রোর্ণবস্ত্র। সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রও নেবার ইচ্ছা আছে।'

—'কতদিন আগে গুর্জর থেকে বেরিয়েছেন, আপনারা?'

'এক বৎসর পার হয়ে গেছে।' প্রবীণ গুর্জরী বণিককে সামান্য অন্যমনস্ক দেখালো। 'গুর্জর বন্দরতীর থেকে আসছি আমরা। বারাণসীতে ছিলাম কয়েক মাস। তারপর পাটলিপুত্র, চম্পা হয়ে এসেছিলাম কজঙ্গলে। সেখানেও মাসাধিক কাল ছিলাম। পাটলি-পুত্রে ব্যবসায় ভালো হয় নি। সে পাটলিপুত্রও আর নেই।' বণিক দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'সত্য! পাটলিপুত্র নগরীর দশা দেখে আমারও মনে বড় দুঃখ হয়েছিল। মগধ সাম্রাজ্যের গৌরবময়ী নগরী। অবশ্য মহাকালের এই তো নিয়ম', ধীর গলায় বললো বিদেশী।

॥ বারো ॥

সন্ধ্যার পর সার্থবাহ দলটি এসে উপস্থিত হলো একটি পান্থশালার সামনে।

উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা প্রশস্ত অঙ্গন। অঙ্গনে কয়েকটি মশাল জ্বলছে।

পান্থশালার প্রৌঢ় কর্তা এসে সার্থবাহ দলটিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে উচ্চ কণ্ঠে দাসদাসীদের ডাকাডাকি শুরু করে দিলো। কর্তাটি আকারে কিঞ্চিৎ স্থূল। গাত্রবর্ণ তাম্রাভ। বিরল কেশ। সপ্রতিভ। মুখ-ভর্তি তাম্বুল। তাম্বুলভর্তি মুখের কথাগুলি স্পষ্ট হলো না বণিকদের কাছে। যত্নের অবশ্য ত্রুটি হলো না।

বিদেশী যুবকটিকে নিয়ে গুর্জরী বণিক এলো একটি অপ্রশস্ত কক্ষে। এটি তার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে।

কক্ষে একটি কাষ্ঠ পর্যঙ্ক। তাতে তালপত্রের আচ্ছাদন। এক কোনে জলপূর্ণ মৃৎ কলস। মৃন্ময় প্রদীপ জ্বলছে আর এক কোনে।

প্রৌঢ় বণিক সতর্কভাবে চারপাশ দেখে নিয়ে কুটিরের দ্বার বন্ধ করলো।

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নামিয়ে বলে উঠলো, 'আমার কাছে কিছু মূল্য-বান রত্ন আছে। আপনি সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ। রাজসভায় আপনার যাতায়াত থাকবে। আপনি তাদের অনুগ্রহ করে জানিয়ে দেবেন'।

কটি বস্ত্রের ভিতর থেকে সুকৌশলে গোপন রাখা একটি ছোট রেশমী থলি বার করলো বণিক।

প্রসারিত বাম তালুর উপর উপুড় করে দিলো থলিটি।

মৃৎ প্রদীপের আলোয় চিক্‌চিক্ করে উঠলো কয়েকটি বহুমূল্য রত্ন। রক্ত মণি আর মরকত। কয়েকটি হীরকখণ্ড।

—'আপনি সভাসদদের অনুগ্রহ করে জানিয়ে দেবেন এই রত্নগুলি

আমি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করতে চাই। পুণ্ড্রবর্ধন নগরে আমি মাসাধিক কাল থাকবো।'

'আমার যথাসাধ্য চেষ্টা হবে—আপনার রত্নগুলি যাতে বিক্রীত হয়,' জানালো বিদেশী।

অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে সে একটি একটি রত্ন তুলে পরীক্ষা করতে লাগলো।

রত্নগুলি নিরীক্ষণ করে বিদেশী যুবক বণিকের উদ্দেশে বললো, 'আপনার রক্ত মণি আর মরকতগুলি উৎকৃষ্ট ধরণের, কিন্তু হীরাগুলি নয়।

প্রীতকণ্ঠে বলে উঠলো প্রৌঢ় বণিক, 'আপনি রত্নপরীক্ষাতেও অভিজ্ঞ! সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের উপযুক্ত গুণই বটে।'

রত্নগুলি একে একে বণিক তুলে নিলো রেশমী থলির মধ্যে।

খট করে একটা ক্ষীণ শব্দ হলো দ্বারের কাছে।

প্রৌঢ় বণিক সতর্ক ও ভীত দৃষ্টিতে তাকালো সেদিকে।

বিদেশী যুবক কিন্তু হরিণের মতো ক্ষিপ্র পদে দ্বারপ্রান্তে গিয়ে অর্গল খুলে ফেলেছে।

দ্বারপ্রান্ত থেকে পলায়মান এক ব্যক্তিকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে বিদেশী তাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এলো।

'কে তুই? কি করছিলি এখানে? তস্কর! এখনই পান্থশালার কর্তাকে ডাকবো আমরা'। সগর্জনে বলে উঠলো সে।

বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ ব্যক্তি ক্ষীণকায়, কিন্তু নির্বল নয়। চোখের দৃষ্টি অতি চতুর এবং সতর্ক। বয়স বেশি নয়। মাথায় উষ্ণীষ, পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় সাধারণ পথিক।

লোকটি পান্থশালার কর্তার নামে আদৌ ভীত হলো না। পরিষ্কার গলায় বলে উঠলো, 'আমি তস্কর নই। মহাশয়, আমাকে ছেড়ে দিন।'

'তবে কে তুমি'? প্রৌঢ় বণিক প্রশ্ন করে। 'তুমি এ কক্ষের দ্বারপ্রান্তে কি করছিলে?'

বিচিত্র মুখভঙ্গি করলো লোকটি।

—'মহাশয়েরা পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা পুণ্ড্রবর্ধনের মহামন্ত্রীর আদেশে পান্থশালার পথিকদের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে থাকি। পান্থশালার কর্তা তা জানেন।'

বজ্রমুষ্টি শিথিল না করে বললো বিদেশী যুবক, 'কিন্তু দ্বারপ্রান্তে কি করছিলে? শুনছিলে আমাদের কথা? না, আমরা কি করছিলাম লক্ষ্য রাখছিলে গোপনে?'

—'আমাদের সব দিকেই দৃষ্টি রাখতে হয়, মহাশয়। সব কিছুই শুনতে হয়। তাছাড়া বিদেশ থেকে একটি সংবাদ পেয়ে এখন বিশেষ-ভাবেই চার দিকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে।'

'কি সংবাদ?' এই বলে প্রৌঢ় বণিক উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'ভয়ের কিছু নেই তো? বহিশত্রুর আক্রমণ—?'

'না, না।' লোকটি মাথা নাড়লো। 'ওসব কিছু নয়'। তার পরে বিদেশী যুবককে অনুনয়ের কণ্ঠে বললো, 'মহাশয়, মুষ্টি শিথিল করুন, আমাকে যেতে দিন।'

'তবে কি সংবাদ'? প্রৌঢ় বণিক আবার বলে। 'অবশ্য যদি কোন অসুবিধা না হয়।'

—'অসুবিধার কি আর আছে, মহাশয়! আপনি বণিক, ইনি সম্ভ্রান্ত রাজ পুরুষ। বলতে বাধা নেই। আমরা একটি গূঢ় সংবাদ পেয়েছি।'

কথা বলতে বলতে কণ্ঠস্বর নামিয়ে, চার দিক দেখে নিয়ে বলে উঠলো মহামন্ত্রীর চর, 'আমরা সংবাদ পেয়েছি, কাশ্মীরের রাজ্যচ্যুত নরপতি ছদ্মবেশে পূব দিকে গমন করেছেন। কোথায় তিনি চলেছেন —কি তাঁর উদ্দেশ্য কিছুই জানা নেই। তাই আরো সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছে—মহামন্ত্রীর আদেশে—'।

বিদেশী যুবক তার বজ্রমুষ্টি শিথিল করে দিলো।

॥ তেরো ॥

কমলা দাঁড়িয়েছিল তার শয়নকক্ষের বাতায়নে।

তার দক্ষিণ হাতের চম্পককলির মতো আঙ্গুলগুলি ছুঁয়ে আছে তার কোমল চিবুক।

বাম হাতের আঙ্গুলগুলি চূর্ণ কুন্তল বিন্যস্ত করছে মাঝে মাঝে, অবশ্যই অন্যমনস্ক ভাবে।

কমলার দৃষ্টি দূর অন্ধকার আকাশে নিবদ্ধ।

কমলার মন আজ বড় চঞ্চল, বড় অস্থির।

আবার কি এক অজানা আনন্দে উচ্ছল।

উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ শান্ত করার জন্যই যেন কমলা তার দুটি মৃণাল বাহু রাখলো হৃদয়ের উপর।

তার দুটি চোখ আবেগে বুজে এলো। ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে ওঠে ক্ষীণ হাসি।

কমলা পরম রূপবতী। পূর্ণযৌবনা তরুণী। সুঠাম দেহবল্লরী। কমলা গৌরাঙ্গী। পদ্মপলাশলোচনা।

তার মাথায় পর্যাপ্ত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি এখন কবরীবদ্ধ। কবরীতে জাতি পুষ্পের মালা জড়ানো।

কমলার অঙ্গে অলঙ্কৃত মহার্ঘ পট্টবস্ত্র। বস্ত্রের রং ঐ দূর অন্ধকার আকাশের মতোই কৃষ্ণনীল।

স্কন্দ-মন্দির থেকে ফিরে এসে কমলা খুলে ফেলেছে তার রত্ন-অলঙ্কারগুলি। কেবল তার কোমল গ্রীবা বেষ্টন করে রয়েছে একটি দীর্ঘ স্বর্ণসূত্র। অন্য অলঙ্কারগুলি প্রিয় পরিচারিকা মাধবী তুলে রেখেছে গজদন্তখচিত সুবর্ণ পেটিকায়।

প্রশস্ত কক্ষের এক ধারে রূপার দীপাধারে প্রদীপ জ্বলছে।

প্রায় অন্ধকার কক্ষ।

কক্ষমধ্যে গজদন্ত নির্মিত—রৌপ্য ও সুবর্ণখচিত প্রশস্ত পালঙ্কের উপরে কোমল শয্যা।

আজ শয্যা শূন্য। ঘুম নেই কমলার চোখে।

সে দাঁড়িয়ে আছে বাতায়নে।

প্রথম গ্রীষ্মের উতলা বাতাসে কমলার চূর্ণ কুন্তল বার বার এলো-মেলো হয়ে যাচ্ছে।

তার তপ্ত দেহ যেন শীতল হলো। কিন্তু বড় ক্লান্ত কমলা।

পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর প্রধানা দেবনর্তকী সে। রূপে গুণে অতুলনীয়া।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় দেবমন্দির-প্রাঙ্গণে নৃত্যগীত পরিবেশন করতে হয় তাকে।

শৈশব থেকে, কঠোর নিয়মের মধ্যে থেকে তাকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে নৃত্যগীত শিক্ষা করতে হয়েছে।

যৌবনে সে পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর দেবনটীদের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।

দত্তা দেবদাসী সে।

অর্থাৎ কেউ তাকে দেবদাসী হবার জন্য দেবস্থানে দান করে গেছে—অতি শৈশবেই।

কি তার জন্ম পরিচয়? কে তার পিতামাতা? কোথায় তার ঘর ছিল ?

কিছুই জানে না কমলা। একটি চাপা নিঃশ্বাস পড়লো তার।

সে কেবল জানে সে যৌবনবতী, রূপবতী। দেবমন্দিরে নৃত্যগীত করে দেবতার মনোরঞ্জন করার জন্যই তার জীবন যৌবন উৎসর্গীকৃত।

নৃত্যগীতে কমলার সম-পারদর্শী কেবল গৌড়দেশে কেন—সমগ্র পূর্বভারতেই বিরল। একথা কমলা বহুবার শুনেছে। সে নিজেও জানে।

দেবমন্দিরের পাষাণ দেবতা তার কলাচর্চা কতোটা উপভোগ করেন, সে কথা তার অজানা। কিন্তু রক্ত-মাংসের মানব যে কমলার

নৃত্য ও গীতবাদ্যের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, কমলাকে দেখলে তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে, এ কথা তার অজানা নয়।

হায়রে! দেবনর্তকীর কি দুঃসহ জীবন! দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ভাবলো কমলা।

যতদিন তার রূপ যৌবন থাকবে, ততদিনই তার সমাদর। তারপর?

তারপর সাধারণ মানুষ ভুলেই যাবে তার কথা।

বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাবে সে।

স্কন্দদেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে নৃত্যগীতের আসরে দর্শকচিত্ত মথিত করবে নবীনা কোন যৌবনবতী দেবনটী।

দেবতার মনোরঞ্জন করাই দেবনর্তকীদের প্রধান কাজ।

নৃত্য-গীত-বাদ্যে তাই মুখর হয়ে ওঠে পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর স্কন্দমন্দির প্রতি সন্ধ্যায়।

তাছাড়া উৎসব অথবা পুজা উপলক্ষে তো প্রায় সারাদিন ধরেই চলে দেবনটীদের নৃত্যগীত।

'দেবতার মনোরঞ্জন করা ছাড়াও—'ভাবতে ভাবতে সামান্য বঙ্কিম হাসির রেখা ফুটলো কমলার ওষ্ঠপ্রান্তে।

নিঃশ্বাস ফেলে সে ভাবলো। দেবতার মনোরঞ্জন করা ছাড়াও রয়েছে তাদের অন্য কাজ। অন্য দায়িত্ব। সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য নেই দেবনর্তকীদের। প্রয়োজন হলে রাজ-আজ্ঞায় বিশেষ অতিথিদেরও মনোরঞ্জন করতে হয়। তবে কমলা রূপেগুণে দেবনটীদের মধ্যে সর্বোত্তমা। তার কথা আলাদা, এক কথায় বলা যায় স্বয়ং পুণ্ড্রবর্ধনপতি জয়ন্তই তাকে বিশেষ স্নেহ এবং অনুগ্রহের চক্ষে দেখেন। অমাত্য সেনাপতি এবং শ্রেষ্ঠিরা কমলার কৃপা-কটাক্ষে নিজেদের ধন্য মনে করেন।

কমলার ধন সম্পদেরও তাই অভাব নেই। সে বিশেষ ধনশালিনী।

এইভাবেই তো একরকম নিশ্চিন্তে কেটে যাচ্ছিল কমলার দিনগুলি। কিন্তু আজ?

আজ সন্ধ্যায় কমলা কাকে দেখলো ? কার দর্শন পেলো সে ?

আর এক দেখাতেই তার জীবন যৌবন মন—তারই পায়ে সমর্পণ করে দেবার জন্য—কমলা কেন এমন ব্যাকুল হয়ে উঠলো !

'দেবী', পিছন থেকে মৃদু কণ্ঠে ডাকছিল মাধবী।

—'কে ? ও, মাধবী ?' পিছন ফিরে তাকায় কমলা।

'দেবী ! রাত্রির তৃতীয় প্রহর শেষ হতে চলেছে। আপনি শয়ন করবেন না ? বিশ্রাম নেবেন কখন ?' মাধবীর গলায় অনুযোগ আর উদ্বেগ।

কমলা সস্নেহে তাকায় মাধবীর দিকে। মাধবী কেবল তার প্রিয় পরিচারিকাই নয়, প্রিয় সখিও বটে।

'সখি মাধবী' ! গাঢ় অন্তরঙ্গ সম্বোধন করে—মাধবীর কাঁধে একটি হাত রাখে কমলা। 'বিদেশী অতিথি কি করছেন এখন ?'

—'অতিথি তাঁর বিশ্রামকক্ষে গভীর নিদ্রায় অভিভূত। আপনার নির্দেশ মতো তাঁর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রাখি নি, দেবী।'

সসম্ভ্রমে উত্তর দেয় মাধবী। কিন্তু সেই সঙ্গে তার চোখের কোনে ক্ষীণ কৌতুকের আভাস ধরা পড়ে যায়, কমলার চোখে।

তাই দেখে কমলা মনে মনে হাসলো। ঈষৎ লজ্জিতও হলো।

মাধবী বুদ্ধিমতী। সে বুঝেছে—বিদেশী অতিথির প্রতি কমলা বড় অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। এক রাত্রেই !

গজদন্তের পালঙ্কে কোমল শয্যায় শুয়েও ঘুম আসে না কমলার চোখে।

প্রথম দর্শনেই যাকে দেখে কমলা এত মুগ্ধ, কে সেই বিদেশী পুরুষ ?

কমলার সুন্দর ললাটে সূক্ষ্ম কুঞ্চনরেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

কে এই বিদেশী ?

দীপ্ত সূর্যের মতো তেজোদৃপ্ত আকার। উন্নত দেহ, সুবর্ণ কান্তি, দীর্ঘনাসা, আজানুলম্বিত বাহু।

বিদেশী যে অতি অভিজাত বংশীয়, তাতে সন্দেহ নেই।

মাধবী শয্যাপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ময়ূরপুচ্ছের ব্যজনী দিয়ে বাতাস করছিল।

তার হাতে মৃদু স্পর্শ দিয়ে কমলা কোমল কণ্ঠে বলে, 'মাধবী, অনেক রাত হয়েছে। তুমি এখন যাও। বিশ্রাম করো।'

মাধবী নীরবে কক্ষ ছেড়ে চলে যায়।

ঘুমোবার চেষ্টা করে কমলা, কিন্তু তার চক্ষু থেকে নিদ্রা আজ রাত্রে বিদায় নিয়েছে যেন।

স্মৃতিপটে ছবির মতো ভেসে ওঠে সন্ধ্যার ঘটনা।

আজ সন্ধ্যায় নগরীর মধ্যস্থিত স্কন্দমন্দিরে দেবদাসী কমলার নৃত্য-গীতের আসর বসেছিল।

বিশাল স্কন্দমন্দিরের স্থাপত্য আর ভাস্কর্য পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর এক বিশেষ শোভা।

গর্ভমন্দিরের ছাদ ক্রমহ্রস্বায়মান হয়ে ধাপে ধাপে উপর দিকে উঠে গেছে। এই ধাপ বা স্তর সাতটি। সাতটি স্তরেই মৃৎ বা প্রস্তরফলকে অসংখ্য কারুকার্যশোভিত। সর্বোচ্চ এবং ক্ষুদ্রতম স্তরের উপর চূড়া। চূড়ার উপর সুবর্ণ কলস।

গর্ভমন্দিরে দেব কার্তিকেয়র প্রস্তর মূর্তি।

বহুমূল্য অলঙ্কারে শোভিত।

ময়ূরপৃষ্ঠে মহারাজ লীলার ভঙ্গিতে আসীন দেব কার্তিকেয়। তার দুই পাশে দেবসেনা ও বল্লী, দেবতার দুই পত্নীর মূর্তি।

গর্ভমন্দিরের সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। অসংখ্য কারুকার্যখচিত প্রস্তর স্তম্ভে সুসজ্জিত।

সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে দেবতার সম্মুখে গান গাইছিল কমলা।

উচ্চ এক বেদিকার উপর লীলায়িত ভঙ্গিতে বসে ছিল সে। তার দুই পাশে ছিল যন্ত্রী আর বাদকের দল, মৃদঙ্গ, করতাল, বীণা ও বাঁশি হাতে নিয়ে।

সে আসরে উপস্থিত ছিলেন স্কন্দমন্দিরের ভক্তবৃন্দ। উচ্চকোটির মানুষেরা এবং উচ্চপদাসীন রাজ পুরুষেরা। উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন রাজ সভাসদ। রাজ পরিবারের কুমারেরাও দু এক জন ছিলেন।

কমলার নৃত্য তাদের বড়ই প্রীতিকর ও নয়ননন্দন, গীত অতি সুখশ্রাব্য।

পুণ্ড্রবর্ধনের অভিজাত পুরুষেরা কমলার বিশেষ স্তাবক। তাকে মূল্যবান উপহার দিয়ে নিজেদেরই কৃতার্থ মনে করে তারা।

কমলা ধ্রুপদী সঙ্গীতের সুর বিস্তার করছিল।

তার কোকিলবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে মোহিত হয়ে গান শুনছিল উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ।

গান গাইতে গাইতে শ্রোতাদের উপর দৃষ্টি রেখেছিল কমলা। এমন সময় সে লক্ষ্য করলো, মন্দিরের তোরণ-দ্বার দিয়ে ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলো এক যুবাপুরুষ।

যুবককে দূর থেকে দেখলেও বিদেশী বলেই মনে হয়। কিন্তু সে পরম রূপবান। উন্নতদর্শন।

যুবকের দেহে যে দু চারটি অলঙ্কার আছে, সেগুলি বেশ মূল্যবান বলেই মনে হলো কমলার।

বেশভূষার পারিপাট্য আছে। কিন্তু সে বেশ অবিন্যস্ত। কটিদেশে তরবারি। মাথায় উষ্ণীষ।

প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে যুবাপুরুষ চকিতে দৃষ্টিক্ষেপ করলো গায়িকার উপর। বেশ কিছুক্ষণ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রইলো কমলার মুখের দিকে।

তারপর প্রাঙ্গণের এক ধারে মর্মর স্তম্ভের পাশের আসনে উপবেশন করলো বিদেশী যুবক। আর অনতিবিলম্বেই সঙ্গীতরসে তাকে মগ্ন দেখলো কমলা।

যুবকের প্রতি দৃষ্টি রাখতে রাখতেই সঙ্গীত পরিবেশন করছিল কমলা। এই অপরিচিত রূপবান যুবক তাকে কেমন যেন আকর্ষণ করছিল।

মগ্নচিত্ত হয়ে কমলার গান শুনছিল বিদেশী। মাঝে মাঝেই অন্য মনে বাম হাতটি তুলে দিচ্ছিল পিছন দিকে। যেন কিছু চায় সে। পর মুহূর্তেই আবার আত্মসম্বরণ করে চারদিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করে আবার হাতটি নামিয়ে রাখছিল উরুর উপরে।

গানের মধ্যেই কমলার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। কিন্তু অভ্যস্ত কণ্ঠে সঙ্গীতের ছন্দ পতন হলো না।

যুবকের এই ভঙ্গি তার অপরিচিত নয়। এ ব্যক্তি সামান্য ব্যক্তি নন।

ধূলিধূসরিতকান্তি এই অপরিচিত যুবা নিঃসন্দেহে কোন উচ্চ-বংশীয় হবেন!

রত্নখচিত স্বুবর্ণ ও রৌপ্য তাম্বুলকরঙ্ক আর স্বুবর্ণভৃঙ্গারে পানীয় নিয়ে কমলার সখীরা উচ্চবিত্ত অভিজাত অতিথিদের পরিচর্যায় রত ছিল।

সঙ্গীত বিরতির অবসরে কমলা ইঙ্গিতে কাছে ডাকলো, মাধবীকে। মাধবী কাছে আসতে কমলা ইশারায় তাকে দেখিয়ে দিলো অদূরে উপবিষ্ট বিদেশীকে। তারপর নত কণ্ঠে তাকে কিছু নির্দেশ দিলো।

নির্দেশ শুনে মাধবী সবিস্ময়ে মুখ তুলে দেখলো অপরিচিত যুবককে। তারপর মাথা নেড়ে কমলার নির্দেশে সম্মতি জানিয়ে সরে এলো।

কমলার অনুমান মিথ্যা নয়।

আবার নৃত্যগীত শুরু হলো।

যন্ত্রীরা বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার তুললো।

এবার কমলা নৃত্য শুরু করলো। দেববন্দনা।

কিন্তু চোখের কোন দিয়ে বিদেশী যুবার দিকে দৃষ্টি রেখেছিলো, সে।

বিদেশী যুবক অচিরেই মগ্নচিত্ত হয়ে নৃত্যগীত উপভোগ করতে লাগলো। সেই সঙ্গে মধ্যে মধ্যে বাম হাতটি কাঁধের পিছনে তুলে দিচ্ছিল সে।

এবার আর শূন্য হাত নামাতে হলো না তাকে।

মর্মর স্তম্ভের আড়াল থেকে মাধবী সেই উত্তোলিত হাতে তুলে দিচ্ছিল মদিরা পাত্র। কখনও বা তাম্বুল।

আরো প্রায় এক দণ্ড পরে সঙ্গীতের আসর শেষ হলো।

উপস্থিত শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দ অভিনন্দন জানালো কমলাকে।

প্রশংসাবাণী শুনে কমলকলিকার মতো ছুটি হাত জোড় করে, মাথা নত করে তাদের উদ্দেশে প্রণাম জানালো, দেবনটী।

ধীরে ধীরে স্কন্দ মন্দিরের প্রাঙ্গণ জনশূন্য হয়ে গেলো।

বিদেশী যুবক এতক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে লক্ষ্য করছিল কমলাকে। এবার যেন সম্বিৎ পেয়ে উঠে দাঁড়ালো।

—'আর্য!' পিছন থেকে সসম্ভ্রমে ডাকলো মাধবী। 'আর্য! আমার স্বামিনী দেবী কমলা আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী। আপনি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আসুন।'

'আমাকে?' আশ্চর্য হয়ে যুবক প্রশ্ন করে। 'আমার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী? কি আশ্চর্য! এ নগরে আমার পরিচিত কেউই তো নেই।'

—'হ্যাঁ আর্য, আপনারই সাক্ষাৎপ্রার্থিনী আমার স্বামিনী।'

বিস্মিত বিদেশী মাধবীকে অনুসরণ করে এলো প্রাঙ্গণের পাশে একটি কক্ষে।

নৃত্যগীতের পর সে কক্ষে বিশ্রাম করছিল কমলা।

বিদেশীকে দেখে যুক্তকরে উঠে দাঁড়ালো দেবনর্তকী।

'আর্য! আপনি মগ্নচিত্ত হয়ে আমার নৃত্যগীত আস্বাদ করছিলেন। অনুমানে মনে হচ্ছে এ নগরে আপনি নবাগত।' সামান্য দ্বিধা করে কমলা আবার বললো, 'আপনার নাম জানতে পারি কি?'

'দেবী', আমার নাম কল্লাট। আমি সত্যই এ নগরে নবাগত। আমি এক ভাগ্যবিড়ম্বিত বিদেশী। এর বেশি কোন পরিচয় আজ আমার নেই।' বলার সঙ্গে 'আজ' কথাটির উপর বেশ জোর দিলো কল্লাট।

'বিদেশী', নম্র গলায় বলে ওঠে কমলা, 'নিজেকে ভাগ্যবিড়ম্বিত ভাবছেন কেন? আপনি তেজস্বী পুরুষ। অচিরেই দৈব আপনার সহায় হবেন।'

'দেবী! আপনার কথা যেন দৈববাণীর মতো বাজলো আমার কানে।' গম্ভীর কণ্ঠে বলে চলে বিদেশী, 'আমিও সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষাতেই আছি।'

কমলা স্নিগ্ধ চোখে তাকায় অপরিচিত বিদেশীর দিকে।

—'কিন্তু ভদ্রে, আপনি কেন আমার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী তা অবশ্য এখনও বলেন নি।'

'আর্য!' সামান্য দ্বিধা করে কমলা বলে ওঠে, 'আপনাকে সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী বলে মনে হলো। তাছাড়া এ নগরে আপনাকে নবাগত বোধ হচ্ছিল আমার। তাই—'

—'হ্যাঁ দেবী। মাত্র আজ দ্বিপ্রহরে উপস্থিত হয়েছি এ নগরে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি। এখন আমাকে বিদায় দিন। পান্থশালায় ফিরতে হবে এবার।'

'আয কল্লাট, আপনি এ নগরে নবাগত। নিজেকে বলছেন ভাগ্যবিড়ম্বিত।' স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে চলে কমলা, 'আপনার আপত্তি না থাকলে আমার গৃহে আতিথ্য নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি আমি। আশা করি অনুরোধ রক্ষিত হবে।'

দেবনর্ত্তকীর আকস্মিক প্রস্তাবে দ্বিধান্বিত চিত্তে চিন্তা করে আগন্তুক। মন স্থির করতে অল্প সময় চলে যায়। কমলা যেন কিছুটা হুতাশ হয়।

পুণ্ড্রবর্ধন শহরের মধ্যে একটি আশ্রয় পেতেই হবে। আগন্তুক কমলার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মৃদু স্বরে বলে, 'দেবী কমলা, আপনার আশাতীত অনুগ্রহে, আমি ধন্য। আমি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এ আমার পরম সৌভাগ্য।'

জ্যোতিষী শিবমিশ্রের গণনার কথা স্মরণপথে আসতেই মনের

মধ্যে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য অনুভব করে কল্লাট। তবে কি ভাগ্য সত্যই প্রসন্ন হচ্ছে! ঈশ্বরের কি অসীম কৃপা।

আশ্রয়দাত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সপ্রতিভভাবে কল্লাট বললো, 'দৈব সহায় হলে, আপনার এ অযাচিত করুণার ঋণ যেন শোধ করতে পারি।'

বিদেশীর কথায় কমলার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে। ভাগ্যবিড়ম্বিত এ অতিতি অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় তো বটেই। কিছুটা অহংকারও যেন প্রকাশ পাচ্ছে তার শেষ উক্তিটির মধ্যে। অবশ্য এই অহংকার বা আত্মবিশ্বাস শোভা পায় এমন পুরুষসিংহকেই।

কমলা আবার যুক্তকরে বললো, 'আমি কৃতার্থ হলাম, আর্য।'

অধিক রাত্রে সেই কথা মনে পড়তে নিজের মনেই হাসলো কমলা শুয়ে শুয়ে।

সহসা নগরীর দূর বনপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো সিংহের গর্জন।

পশুরাজের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় রাতের অন্ধকার। কমলার চিন্তার জালও ছিড়ে যায় সেই সঙ্গে।

এস্তে শয্যার উপরে উঠে বসে কমলা।

ওই সেই মহা সিংহ!

ওই মহাসিংহের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে পুণ্ড্রবর্ধনের নাগরিক জীবন।

মনুষ্যহত্যা যেন সিংহের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। এছাড়া যথেচ্ছ পশু হত্যা করছে এই হিংস্র পশুরাজ। প্রতি প্রভাতে নগরপ্রান্তে পড়ে থাকে রক্তাক্ত অর্ধ-ভক্ষিত মানুষ ও পশুর শব।

তাই নগর-উপকণ্ঠের ভীত নাগরিকেরা সিংহের ভয়ে সন্ধ্যার আগেই নিজ নিজ গৃহে আশ্রয় নেয়। গৃহদ্বার রুদ্ধ করে দেয়।

এই সিংহের উৎপীড়নে আতঙ্কিত নাগরিকদের জন্য রাজা জয়ন্তও চিন্তিত। তিনি সিংহ নিধনের জন্য উচ্চমূল্যের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সাহসী বীরই সিংহ নিধন করতে সক্ষম হলো না।

আবার ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করে কমলা।

মুদিত হলো তার দুই পদ্ম আঁখি!

॥ চোদ্দ ॥

পরদিন প্রভাত।

কমলা বসেছিল তার গৃহের প্রশস্ত অঙ্গনের মর্মর বেদিকার উপর।

প্রিয় পারাবতগুলিকে শস্য খাওয়াচ্ছিল সে।

মুষ্টি ভরে শস্য দানা ছড়িয়ে দিলো অঙ্গনে।

পারাবতগুলি উড়ে উড়ে বসছে চতুর্দিকে।

সদ্যস্নাত কমলার মূর্তি অত্যন্ত স্নিগ্ধ।

তার পরনে শুভ্র পট্টবস্ত্র।

আলুলায়িত কুন্তল পিঠের উপর ছড়ানো।

কমলার কানে নবতাল পত্রের কর্ণাভরণ। বাহুতে, গলায় সদ্য-প্রস্ফুটিত জাতি পুষ্পের মালা। তার দেহে অন্য কোন স্বর্ণ বা রত্ন আভরণ নেই।

কপালে কস্তুরী তিলক।

প্রিয় পারাবতগুলি নির্ভয়ে এসে বসছে কমলার কাঁধে, কমলার কোলে।

পারাবতদের পরিচর্য্যা করে, মালা গাঁথছিল কমলা।

তার সামনে রূপার থালায় পদ্ম পত্রের উপর রাখা সদ্য চয়িত নানা ধরণের সুগন্ধি ফুল।

মালা গাঁথতে গাঁথতে গুণগুণ করে গান গাইছিল।

তার মন কিছুটা চঞ্চল।

গত রাত্রে নবাগত বিদেশীকে দেখে অবধি যেন মুগ্ধ ও বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

নিজের মনকে এত চঞ্চল দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে উঠছে কমলা।

অনেক পুরুষই সে দেখেছে।

সমাজের উচ্চ কোটির সব সম্প্রদায়ের পুরুষদের সে দেখেছে। কিন্তু এ বিদেশীকে দেখে পর্যন্ত তার চিত্ত এত অস্থির কেন?

মাধবীকে সে গৃহাভ্যন্তরে পাঠিয়েছে। বিদেশী অতিথির ঘুম ভেঙেছে কিনা দেখবার জন্য।

মালা গাঁথতে গাঁথতে কমলা বারবার উৎসুক চোখে তাকাচ্ছিল ওরা আসছে কিনা দেখবার জন্য।

মাধবীকে অনুসরণ করে বিদেশী অতিথি এসে দাঁড়ালো। তার সামনে।

কল্লাটও সদ্যস্নাত।

তার পরিধানে পরিচ্ছন্ন নতুন বেশ। কমলার উপহার।

নবোদিত সূর্যের মতো তেজস্বী রূপবান পুরুষটি তার সামনে এসে দাঁড়াতে, তাকে অভিবাদন জানালো কমলা।

'আর্য কল্লাট! রাতে আপনার সুনিদ্রা হয়েছিল তো? কোন অসুবিধা হয় নি?' কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করে কমলা।

কমলার পাশে মর্মর বেদিকার উপর উপবেশন করে বিদেশী অতিথি। অমায়িক হাস্যে বলে উঠলো, 'অসুবিধা! বহুদিন পরে আবার সুবর্ণ পালঙ্কের কোমল শয্যায় শয়ন করেছি। সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটতে পারে কি?'

'বহুদিন পরে সুবর্ণ শয্যায় শয়ন করেছি—'কথাটি কানে যেতেই চকিতে কল্লাটের দিকে তাকায় কমলা।

কল্লাটও কথাটি আচমকা উচ্চারণ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো কমলার মুখের দিকে। ক্রমে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা মিলিয়ে গেলো। ফিরে এলো প্রসন্নতা।

কমলাও নীরবে তাকিয়ে দেখছিল তাকে। তার চোখেও বিস্ময় আর কৌতুকের আনাগোনা চলেছে।

'আর্য কল্লাট, ধীর স্বরে কমলা বলে চললো, 'আপনি আমার সম্মানিত অতিথি। আপনার পূর্ব পরিচয় জানি না। আমার কৌতূহলও নেই। তবে আপনি যে অতি উচ্চবংশীয়, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

কমলার সংযত কৌতূহলে প্রসন্ন হলো কল্লাট।

গম্ভীর গলায় সে বলে উঠলো, 'ভদ্রে, আমি সত্যই এক ভাগ্য-বিড়ম্বিত বিদেশী। অতি দুর্দশায় পড়েছি সম্প্রতি। তস্করে আমার সর্বস্ব অপহরণ করেছে, দেহের অলঙ্কারগুলি ছাড়া। এর বেশি কোন পরিচয় এই মুহূর্তে আর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।'

কমলা কল্লাটের কথায় যেন গুরুত্ব দিলো না।

মালা গাঁথতে গাঁথতে আপন মনেই বলতে লাগলো, 'তা ছাড়া, আপনি সঙ্গীতরসিক। আমার গীত ও নৃত্যের তালে তালে আপনি যথাযথ নিয়মে অঙ্গুলি সঞ্চালন করছিলেন।'

কল্লাট হাসলো কমলার কথা শুনে।

প্রসন্ন মুখে বলে উঠলো, 'ভদ্রে, আপনি কেবল নৃত্যগীতপটিয়সী অসামান্যা রূপবতী নন, আপনি খুবই বুদ্ধিমতী। সত্যই সেদিন সন্ধ্যায় পুণ্ড্রবর্ধন নগরীতে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত শরীরে উপস্থিত হয়েছিলাম স্কন্দমন্দিরের কাছে।' ঈষৎ হাসলো কল্লাট।

মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো কমলা। নিজের কথার রেশ টেনে কল্লাট বলে চললো, 'সুন্দরী, ভরত মুনির সঙ্গীত-নাট্য-শাস্ত্র অনুযায়ী সঙ্গীত-চর্চার কিছু জ্ঞান আমারও আছে।' কল্লাট থামে না।

—'আপনার গান শুনে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। স্কন্দমন্দিরের কাছে এসে দাঁড়াতে, কানে এলো ভরত মুনির সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত, নির্ভুল তাল লয়ে গীত, রমণীকণ্ঠের সুললিত রাগিনী। আপনার

সেই সুরমাধুরী আস্বাদ করবো বলেই, কার্তিকেয়-মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছিলাম।

কথা বলতে বলতে কল্লাট সুপ্রশস্ত মর্মর বেদিকার উপর রক্ষিত কমলার বীণার তার স্পর্শ করলো। ঝঙ্কার উঠলো বীণার তারে।

নত মুখে বসেছিল কমলা।

কল্লাটের প্রশংসাবাণী শুনে মুখ আরক্ত হলো তার। নত মুখেই সে তাকিয়ে রইলো বীণার তারে কল্লাটের হস্ত সঞ্চালনের দিকে।

কল্লাটের হাতে রত্ন-খচিত কেয়ুর।

প্রভাতসূর্যের দীপ্তি ঠিক্‌রে পড়ছে মাণ-মাণিক্যের উপর। কমলা সেইদিকে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলতে লাগলো, 'আর্য, আপনি যে কেবলমাত্র প্রকৃত সঙ্গীতরসিকই নন, উচ্চ-বংশোদ্ভূতও, সে কথাও সেদিন আমার কাছে গোপন ছিল না।'

বীণার তারে হস্ত সঞ্চালন থামিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে কমলার দিকে মুখ তুলে তাকালো কল্লাট। মুহূর্তের সংশয় তার মনে। তার ভ্রূযুগল সামান্য কুঞ্চিত।

'আমার বংশগৌরবের কথা আপনি কি করে জানলেন?' অনুত্তেজিত স্বরে বললো কল্লাট।

কমলা মৃদু হাসলো, এই কথায়।

মালা গাঁথতে গাঁথতেই মৃদু কণ্ঠে বললো, 'আপনি সঙ্গীতরসে মগ্ন হয়ে গেলেন। অভিজাত পুরুষের আচরণ আমার অজ্ঞাত নয়, আর্য। দেখলাম, মগ্নচিত্ত হয়ে আপনি বারবার বাম করতল কাঁধের উপর দিয়ে উত্তোলিত করছিলেন। তার অর্থ, আপনি যেখানে থাকেন, গীতবাদ্য শোনেন, আপনাদের কাছে সর্বদাই তাম্বুল-করঙ্ক বাহিকা আর পানপাত্র বাহিকা প্রস্তুত থাকে।' একটু হাসলো কমলা।

কল্লাটের চোখ দুটি বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সপ্রশংস দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে কমলার দিকে। তারপর কমলার গাঁথা মালা নিয়ে খেলা করতে লাগলো।

তার মুখে কোন কথা নেই।

কমলা মাথা নীচু করে মালা গাঁথতে থাকে।

নিজের মনেই সে বলে চলে, 'সেদিন সঙ্গীত শুনতে শুনতে আপনি সম্ভবতঃ আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন।'

কমলা চকিতে মুখ তুলে বঙ্কিম কটাক্ষে একবার কল্লাটের মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে বলে, 'আপনার ভঙ্গি দেখে, আমি প্রিয় পরিচারিকা মাধবীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আপনার কাছে। সে পানীয়ের পাত্র আর তাম্বুল দিয়ে আপনার পরিচর্যা করেছিল।'

'অসাধারণ আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা!' মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে ওঠে কল্লাট। 'দেবনর্তকী, আপনি প্রখর বুদ্ধিশালিনী। আমি সত্যই আপনার গুণমুগ্ধ হয়ে উঠছি।'

একটু থেমে আবার গাঢ় গলায় বলে ওঠে, 'সময় এলে আপনাকে আমি পূর্ণ পরিচয় অবশ্যই দেবো। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম, দেবী।'

'আমার কিছুই প্রার্থনা নেই, আর্য। কেবল কিছুকাল আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে ধন্য করবেন আমাকে, এইমাত্র কামনা।' বলতে বলতে স্মিত মুখে কল্লাটের দিকে চোখ তুলে তাকায়, কমলা।

কল্লাট মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে ওরই মুখের দিকে। কমলার কর্ণমূল রক্তিম হয়ে উঠলো। হাতের মালাটি নিয়ে নত মুখে নাড়াচাড়া করতে লাগলো, দেবনর্তকী।

কল্লাটের রূপ তার চিত্তকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কল্লাটের কানে মণিময় কুণ্ডল, গলায় মুক্তাহার। হাতে মণিখচিত কেয়ুর।

গৌরবর্ণ, দীর্ঘ দেহ। বিস্তৃত বক্ষপুট—যে কোন রমণীর কাঙ্ক্ষিত।

আবেগ-বিহ্বলতায় সর্বশরীর কেঁপে ওঠে কমলার। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে, নতমুখে বলে সে, 'আর্য, আমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে তো?'

'দেবী, আপনি আমার আশ্রয়দাত্রী। আপনার আদেশ লঙ্ঘন করি, এমন সাধ্য আমার নেই।' স্নিগ্ধ গলায় বলে ওঠে, কল্লাট।

কমলার চিত্তচাঞ্চল্য—তার লক্ষ্য এড়ায় নি। তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সে অনুনয়ের সুরে বললো, 'এবার আমার প্রার্থনা রক্ষা করবেন, কথা দিন, আপনি।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় কমলা।

—'আপনার গাঁথা এই জাতিপুষ্পের মালাটি আমাকে দিন, এই মালা কণ্ঠে ধারণ করবো আমি।'

নত মুখে তার হাতে মালাটি তুলে দেয় কমলা।

আজ কল্লাটের মাথায় উষ্ণীষ নেই।

সে গলায় পরে নেয় কমলার গাঁথা জাতিপুষ্পের মালাটি। তাকে একবার দেখেই, চোখ নামিয়ে নিলো কমলা।

'মালাটি গলায় পরে কৌতুক-উচ্ছল সুরে কল্লাট বলে ওঠে, 'দেবী! এবার আপনার অনুমতি নিয়ে নগরভ্রমণে যেতে পারি কি?'

একজন পরিচারককে ডেকে অতিথির অশ্বটি প্রস্তুত করার আদেশ দিতে যায় কমলা।

—'অশ্ব থাক, দেবী। আমি পদব্রজেই নগর পরিভ্রমণ করতে চাই।'

প্রাঙ্গণ পার হয়ে যাবার সময় ফিরে দাঁড়ায় কল্লাট।

—'নগরের উপকণ্ঠে এবং পান্থশালায় একদল গুর্জরদেশীয় বণিক এসেছে। বণিক দলপতির কাছে আছে মহার্ঘ বারাণসী বস্ত্র। আর উৎকৃষ্ট রক্তমণি ও মরকত। দেবী, মনে হয়, এ নগরের সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের সঙ্গে আপনার ভালোই পরিচয় আছে। বণিকদের কথা তাদের সকলকে যদি জানিয়ে দেন, তবে খুব ভালো হয়। দলপতি অতি সজ্জন। আমি ওঁর কাছে উপকৃত।'

বিদেশী পুরুষের স্বচ্ছন্দ আচরণ এবং সহজ সরল কণ্ঠস্বরের মোহজালে স্বপ্ন-মগ্ন হয়ে, কমলা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো।

॥ পনের ॥

পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর শোভা দেখে মুগ্ধ হলো, কল্লাট। গতকাল সে ছিল ক্লান্ত এবং চিন্তায় অবসন্ন এক ভাগ্যবিড়ম্বিত পথিক। পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর শোভা দেখার মতো মানসিক অবস্থা গতকাল তার ছিল না।

আজ প্রভাতে কমলার গৃহে বিশ্রাম আর আপ্যায়নে তৃপ্ত হয়ে, কল্লাট সন্তুষ্ট মনে পর্যটনে বার হলো।

গ্রীষ্মের সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাত। চারদিকে দিনের কর্ম-ব্যস্ততা।

পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর আয়তন দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বেশ বড়।

নগরীর দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে প্রবাহিত হচ্ছে বেগবতী নদী।

নদীর নাম করতোয়া।

কল্লাট সপ্রশংস দৃষ্টিতে নগরীর স্থাপত্যশৈলী পরিদর্শন করতে করতে পথ চলতে লাগলো। রীতিমত সুরক্ষিত নগরী।

নগরীর দুটি অংশ। একটি অংশ পরিখাচিহ্নিত ও প্রাকারবেষ্টিত। এই অংশেই প্রকৃত নগরী গড়ে উঠেছে।

নগরী, চারপাশের সমভূমি থেকে বেশ উঁচু। চারদিকে প্রাকার, প্রাকারের চার কোনে প্রহরা দেবার জন্য প্রাকারমঞ্চ। এরই মধ্যে রাজপ্রাসাদ। রাষ্ট্রের অধিকরণ গৃহ, রাজ কর্মচারীদের গৃহ। তাছাড়া উচ্চবিত্ত বণিক, ব্যবসায়ী এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের আবাস। মন্দির, প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র, সভাগৃহ এবং সৈনিকদের বাসস্থান, সবই এই প্রাকারবেষ্টিত নগরীর প্রথম অংশে।

উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিমে সরল রেখার মতো চলেছে রাজপথ। সুপ্রশস্ত প্রধান রাজপথটি চলে গেছে রাজপ্রাসাদের সামনে। সেই পথের দু' পাশেই সম্ভ্রান্ত ধনী নাগরিকদের সুরম্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা। অট্টালিকার মাথায় সুবর্ণ কলস।

মধ্যে মধ্যে প্রমোদকানন, পুষ্করিণী। অতি সুন্দরী শোভাময়ী নগরী।

রাজপথের দুই পাশে সারি সারি বিপণি।

বিপণির পণ্যসম্ভার দেখে মুগ্ধ হলো বিদেশী।

স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার। মণিকারের বিপণি।

মহার্ঘ রেশম বস্ত্র। অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র। সুদূর যবন দেশেও নাকি এই সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের চাহিদা আছে।

তীক্ষ্মধার অসি ও ছুরি। চাষ করবার লৌহময় যন্ত্রফলা।

লোভনীয় পিষ্টক, মিষ্টান্ন ও লাড্ডুর সম্ভার।

নগরীর দ্বিতীয় অংশ—অর্থাৎ প্রাকারবেষ্টিত নগরীর বাইরে, নগরোপকণ্ঠ।

এখানেও বাসগৃহ, মন্দির—সবই বর্তমান।

পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর সমাজসেবক, শ্রমজীবী সম্প্রদায়, সাধারণ গৃহস্থ, তারা সকলেই এই অংশে বাস করে।

নগরীর ধনী ব্যক্তিদের সুরম্য প্রমোদকাননও এই অংশে অবস্থিত।

প্রাকারবেষ্টিত নগরের থেকে নগর উপকণ্ঠে যাতায়াতের জন্য উত্তর আর দক্ষিণে সুপ্রশস্ত নগরদ্বার রয়েছে।

নগরোপকণ্ঠে নদীতীরে ঘন অরণ্য।

নদীতীরে একটি বৃক্ষের নীচে উপবেশন করে এক দৃষ্টে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে কল্লাট।

অদৃষ্ট তাকে নিয়ে এসেছে—পূর্ব দেশে।

প্রধানা দেবনটী কমলার গৃহে আশ্রয় পেয়েছে। অযাচিত ভাবে। এ তার পরম সৌভাগ্য।

দেবনটী কমলার মাধ্যমেই পুণ্ড্রবর্ধনের রাজসভায় উপস্থিত হবার সুযোগ হতে পারে হয়তো! দেখা যাক।

এতদিন ধৈর্য ধরে আছে সে। আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়, হোক।

বেগবতী স্রোতস্বিনীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেক দূরে তার নিজের দেশের বেগবতী নদীর কথা মনে পড়ে গেলো।

কল্লাট স্থির করলো, সে আজ সন্ধ্যায় ঐ নদীর তীরে সন্ধ্যা বন্দনা করতে আসবে।

॥ ষোল ॥

পুণ্ড্রবর্ধনের রাজপ্রাসাদ

রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসে চিত্র রচনা করছিলেন রাজকুমারী কল্যাণদেবী।

তার পাশে বসেছিল প্রিয় সখি চিত্রমতিকা।

চিত্রমতিকা মনোযোগ সহকারে রাজনন্দিনীর শিল্পচর্চা দেখছিল। মাঝেমাঝে রাজনন্দিনীর নির্দেশ মতো তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছিল রঙের পাত্র, তুলি।

উন্মুক্ত বাতায়নপথে সূর্যকরের রেখা এসে পড়েছে রাজনন্দিনীর ভ্রমরকৃষ্ণ দীর্ঘ কেশগুচ্ছের উপরে।

রাজকুমারীর পিছনে অদূরে একটি সচ্ছিদ্র পাত্র থেকে নির্গত হচ্ছে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ার নাল সর্পিল রেখা।

এক দাসী রাজনন্দিনীর কোমল কেশগুচ্ছ সেই ধোঁয়ায় সুবাসিত করে নিচ্ছে।

'চিত্রমতিকা', চিত্ররচনায় নিরত থেকেই কল্যাণদেবী প্রশ্ন করলেন, 'পুণ্ড্রবর্ধনের বিভীষিকা ঐ দুরন্ত সিংহটাকে কেউ বধ করতে পারছে না কেন, বল তো?'

হাতের তুলি সরিয়ে চিত্রমতিকার দিকে তাকালেন কল্যাণদেবী।

রাজনন্দিনীর আয়ত লোচন। চক্ষুতারকা কৃষ্ণ। দীর্ঘ পক্ষ্ম।

'শুনেছি, আজ প্রভাতেও ঐ পশুটা একজন আহীরকে হত্যা করেছে। তার দেহ ভক্ষণ করেছে। মুণ্ড আর সামান্য দেহ-অবশিষ্ট

বলো, বলো, আমি কি করছিলাম তখন? শঙ্খধ্বনি করছিলাম, না তোমার বাসর কক্ষে আড়ি পাতছিলাম?'

'তোর সব কথাতেই পরিহাস।' এবার ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, কল্যাণদেবী। 'যা, তবে তোকে কিছুই বলবো না।'

'না, না। আর চপলতা করবো না। বলো সখি, তোমার স্বপ্নের কথা।' অনুনয় করে চিত্রমতিকা।

নীরবে কি যেন ভাবছিলেন রাজনন্দিনী।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

সন্ধ্যার বাতাস বারবার স্পর্শ করে যাচ্ছে দুই তরুণীর বরতনু।

অন্ধকার আকাশে ফুটে উঠছে একটি দুটি তারা।

পরিচারিকারা এসে প্রতি কক্ষে জ্বেলে দিয়ে গেলো সুবর্ণদীপাধারে সুগন্ধি দীপ। পুষ্প মাল্য রেখে গেলো সুবর্ণথালিকায়।

'চিত্রমতিকা', অস্ফুট কণ্ঠে কল্যাণদেবী বলতে লাগলেন, 'চিত্রমতিকা, কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি পর্বতবেষ্টিত এক সুরম্য প্রদেশের।

আমি দাঁড়িয়ে আছি সে দেশের এক বিশাল জলাশয়ের তীরে।

জলাশয়টি প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে পরিপূর্ণ।'

বলতে বলতে কল্যাণদেবীর গলার স্বর গম্ভীর হয়ে আসে। দুটি হরিণ নয়নের দৃষ্টি হয়ে ওঠে স্বপ্নাতুর।

—'সেই পদ্মশোভিত জলাশয়ে খেলা করছে এক অপরূপ শ্বেত হস্তী। তার মাথায় গজমুক্তা। শ্বেত হস্তী উঠে এলো জলাশয় থেকে। তার শুঁড়ে জড়ানো শ্বেত পদ্ম। আমি পদ্মটি নেবার জন্য হাত বাড়ালাম। কিন্তু',—থেমে গেলেন রাজকন্যা।

'কিন্তু কি? তারপর কি হলো রাজনন্দিনী? থেমে গেলে কেন?' উদ্‌গ্রীব চিত্রমতিকা প্রশ্ন করে।

কথার ছিন্নসূত্র ধরে রাজকুমারী আবার বলতে শুরু করলেন,

'কিন্তু দেখি, অদূরে দাঁড়িয়ে আছে এক পরম রূপবতী। গজরাজ

প্রথমে তার হাতেই পদ্ম দিলো। তারপর আমাকে। তারপর সেই শ্বেত হস্তী এগিয়ে চলে পর্বতশ্রেণীর দিকে। তাকে অনুসরণ করলাম আমি। সেই রমণীও চললো আমারই সঙ্গে। একি স্বপ্ন বলতো?'

—'চলো, আগামী কাল প্রভাতে গ্রহাচার্যকে জিজ্ঞাসা করবো। তিনি বলে দেবেন, তোমার স্বপ্নের অর্থ কি।'

'চিত্রমতিকা', কোমলকণ্ঠে বলে চলেন কল্যাণদেবী, 'চিত্রমতিকা, আমার বাম চক্ষু স্ফুরিত হচ্ছে। বাম অঙ্গ হচ্ছে স্পন্দিত। কি এক পরম প্রাপ্তির আশায় আমার দেহ মন যেন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠছে।'

—'এতো বড় শুভ লক্ষণ! তোমার বিবাহের শুভক্ষণ সমাগত, রাজকুমারী।'

উৎফুল্ল হয়ে ওঠে চিত্রমতিকা। 'এবার বুঝি সখির বিবাহের ফুলটি ফুটতে চলেছে--'!

মৃদু হেসে থেমে যায় সে। তার মনে পড়ে যায়—রাজনন্দিনীর সদ্য রচিত চিত্রটির কথা। নিজের মনেই হেসে ফেলে চিত্রমতিকা। তুষারাবৃত গিরিশিখর, শ্বেত হস্তী—

'হাসছিস যে?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন কল্যাণদেবী।

—'ও কিছু নয়, সখি। বড় আনন্দ হচ্ছে তোমার বিবাহের কথায়। চলো সখি। তোমার সান্ধ্য প্রসাধনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কবে যে তোমাকে মনের আনন্দে বধূবেশে সাজাবো, সেই সেদিনের প্রতীক্ষায় রয়েছি।'

॥ সতের ॥

সেদিন সন্ধ্যার পরেই দেবমন্দির থেকে ফিরে এলো কমলা।

সে ভেবেছিল আর্য কল্লাট বুঝি তার সঙ্গে মন্দিরে তার নৃত্যগীত উপভোগ করতে যাবে।

মন্দির-প্রাঙ্গণে গান গাইবার সময় সে বারবার উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছিল উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাদের দিকে।

কিন্তু তাদের মধ্যে কল্লাটকে দেখতে পায় নি কমলা।

কিন্তু কমলার কৃপা-কটাক্ষ তার প্রতি ঘন ঘন বর্ষিত হচ্ছে ভেবে নিয়ে কমলার রূপমুগ্ধ তরুণ এক শ্রেষ্ঠিপুত্র বড় পুলকিত হলো।

দেবনটীর নৃত্যগীত শেষ হলে শ্রেষ্ঠিপুত্র এসে উপস্থিত হলো কমলার বিশ্রাম কক্ষে, তার দর্শনপ্রার্থী হয়ে।

মন্দিরের সংলগ্ন এই ক্ষুদ্র কক্ষে বিশ্রাম নেয় কমলা, প্রসাধনও করে নৃত্যের আগে।

মাধবীকে শিবিকা প্রস্তুত আছে কিনা, তারই সংবাদ নিতে পাঠিয়ে-দিলো সে।

বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না তার। আর্য কল্লাটের সঙ্গ লাভ করার জন্য তার মন প্রাণ উন্মুখ ছিল।

উত্তেজিত মনকে শান্ত করবার জন্য বিশ্রামকক্ষে বসে কিঞ্চিৎ মৈরেয় পান করেছিল সে। এমন সময় মাধবীর পিছনে পিছনে তরুণ শ্রেষ্ঠিপুত্রকে আসতে দেখে বিস্মিত হয় দেবনটী।

—'দেবী কমলা! আপনার কৃপা-কটাক্ষে আজ আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করেছি। একদিন আপনার গৃহে নিভৃতে একান্তে সঙ্গীত শ্রবণ করার ইচ্ছা আমার প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি আপনার গুণ-মুগ্ধ। আমার এই সামান্য দান গ্রহণ করে ধন্য করবেন আমাকে।'

গলা থেকে বহুমূল্য মুক্তার হারটি খুলে কৃতাঞ্জলি হয়ে শ্রেষ্ঠিপুত্র দাঁড়ায় কমলার সামনে।

—'সিংহলী মুক্তার মালা। আমার পিতা সম্প্রতি এনেছেন সিংহল থেকে।'

চক্ষু বিস্ফারিত করে কমলা চেয়ে থাকে বণিকপুত্রের দিকে।

কমলার রূপ যৌবনের এতই দাম!

অন্য একজনের প্রতীক্ষায় সে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। আর এ নির্বোধ রূপমুগ্ধ তরুণ ভেবেছে কমলা তার প্রতি কটাক্ষ করছে!

'ভদ্র', বিনীত স্বরে বলে কমলা, 'আপনার এ বহুমূল্য দান গ্রহণ করতে আমার মতো সামান্য দেবনটী অক্ষম। আপনি আমার সঙ্গীত শ্রবণে যদি প্রীত হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে আপনার গলার ঐ পুষ্পমাল্যটি উপহার দিন। আমি তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করবো।'

বিস্মিত শ্রেষ্ঠিপুত্র হতবাক হয়ে নিজের গলার গন্ধপুষ্পমালাটি তুলে দেয় কমলার হাতে।

মালাটি কবরীতে জড়িয়ে নেয় কমলা। যুক্তকরে অভিবাদন জানায় শ্রেষ্ঠিপুত্রকে।

—'ভদ্র! আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। পরে একদিন আমার গান শোনাবো আপনাকে।'

মাধবীকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত শিবিকায় গিয়ে ওঠে কমলা।

শিবিকা এসে থামে কমলার গৃহপ্রাঙ্গণে।

লঘু পায়ে শিবিকা থেকে নেমে আসে কমলা।

সামনেই দেখতে পায় আর এক পরিচারিকা চতুরিকাকে।

—'চতুরিকা, বিদেশী অতিথি এখন কি করছেন? তাঁকে ঠিকমত আপ্যায়ন করেছো তো?'

'দেবী', উদ্বিগ্ন মুখে চতুরিকা জানালো, 'আর্য কল্লাট সন্ধ্যার বহু আগেই নগর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। এখনো তিনি ফেরেন নি।'

—'সেকি? আর্য কল্লাট এ নগরে নবাগত। কোথায় গেলেন তিনি? সর্বনাশ! যদি তিনি নগরোপকণ্ঠে চলে গিয়ে থাকেন?

নদী তীরে? মহাসিংহের অত্যাচারের কথা তো তাঁর অজানা। কি করি আমি?' উৎকণ্ঠায় বিবর্ণ হয়ে যায় কমলার সুন্দর মুখখানি। গভীর হতাশায় সে বসে পড়ে অঙ্গনের মর্মর বেদিকার উপরে।

দাসদাসীরা উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

গৃহস্বামিনীর ব্যাকুলতা তাদেরও অন্তর স্পর্শ করেছে। এমন সময় দ্বাররক্ষী দ্রুত পায়ে সংবাদ নিয়ে এলো, আর্য কল্লাট ফিরেছেন।

কল্লাট এসে দাঁড়ালো অঙ্গনে।

'আর্য কল্লাট', রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে কমলা, 'আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি কোন বিপদের মুখে পড়েন নি।'

—'আপনাদের উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে। কি বিপদের সম্ভাবনা, ভদ্রে কমলা?'

বিস্মিত কল্লাট প্রশ্ন করে।

'আর্য, আপনি এ নগরে নবাগত। আপনি জানেন না এক মহাসিংহের অত্যাচারে পুণ্ড্রবর্ধনের নাগরিকেরা অত্যন্ত উৎপীড়িত, উৎকণ্ঠিত। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নগর উপকণ্ঠের পার্শ্ববর্তী অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসে দুরন্ত পশু। যথেচ্ছ প্রাণী হত্যা করে চলে। তার ভয়ে নগরপ্রান্তের অধিবাসীরা কোন কাজ করতে পারে না। সন্ধ্যার আগেই যে যার গৃহে আশ্রয় নিয়ে প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেয়। নগরীর শান্তি হরণ করেছে দুরন্ত পশুরাজ।'

'পুণ্ড্রবর্ধনের অরণ্যে মহাসিংহ? কেউ তাকে বধ করতে পারছে না?'

কৌতূহলী কল্লাট জিজ্ঞাসা করে।

'পশুরাজ মহাবলী, বড় ভয়ঙ্কর। তাকে বধ করতে গিয়ে কতজন যে নিহত হয়েছে।' জানায় কমলা।

একটু থেমে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, আর্য?'

'আমি গিয়েছিলাম করতোয়া নদীর তীরে। সন্ধ্যা বন্দনা করতে,
ধীর গলায় বলে কল্লাট।

'সর্বনাশ! নগর উপকণ্ঠের অরণ্যেই সিংহের অবস্থান! আমাদের সৌভাগ্য, আপনি কোন বিপদের মুখে পড়েন নি। তার আগেই নিরাপদে ফিরে এসেছেন।' উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে ওঠে কমলা।

'নিরাপদ আশ্রয়!' একটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কল্লাটের কপালে দেখা দিলো কুঞ্চনরেখা। অধর দংশন করলো সে। তারপর গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, 'সিংহের ভয় আমার নেই, দেবী। আমি ক্ষত্রিয়, অস্ত্রজীবী। প্রাণের ভয় করি না আমি, সিংহ দূরের কথা।'

ঈষৎ আহত গর্বিত ভঙ্গিতে কথা শেষ করে কল্লাট।

কমলা বুঝতে পারে কল্লাটের আত্ম-অভিমানে আঘাত লেগেছে। তার আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গি দেখে, তার কথা শুনে, কল্লাটের উপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। কোমল কণ্ঠে বলে উঠলো, ক্ষমা করবেন, আর্য। আমি সামান্যা নারী। প্রিয়জনের জন্য মেয়েদের মনে উৎকণ্ঠা থাকা স্বাভাবিক তাই--'

আবেগের মুখে প্রিয়জন শব্দটি সহসা উচ্চারণ করে ফেলে লজ্জিত হলো কমলা। তার নত দৃষ্টি তুলে ধরলো বিদেশী অতিথির দিকে। দেখলো কল্লাটের নিস্পলক দৃষ্টি তার মুখেই আবদ্ধ। সে দৃষ্টি গাঢ়, গভীর। কমলার কপোল আরক্ত হয়ে উঠলো। শ্রেষ্ঠিপুত্রের দেওয়া যে মালাটি তার কবরীতে জড়ানো ছিল, সেই মালাটি হাতে নিয়ে আবার নত মুখে আঙ্গুলে জড়িয়ে খেলা করতে লাগলো সে।

কমলার মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরালো না কল্লাট। গভীর স্বরে বলে উঠলো, 'প্রিয়জন মনে করে আমাকে ধন্য করলেন, দেবী।'

॥ আঠার ॥

রাত্রি প্রভাত হলো।

নিজের শয়ন কক্ষের কোমল শয্যায় শুয়ে কমলার বিনিদ্র রজনী কেটে গেলো।

গত রাতের কথা মনে পড়তে আত্মধিক্কারে, লজ্জায় সর্ব দেহ শিহরিত হলো কমলার।...

প্রগাঢ়যৌবনা দেবনর্তকী নিজেই ভেবে পেলো না, বিদেশী যুবককে দেখে পর্যন্ত নিজেকে কেন স্থির রাখতে পারছে না।

গতকাল সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ মৈরেয় পান করেছিল সে, অশান্ত মনের উত্তেজনাকে প্রশমিত করার জন্য। কিন্তু মন তো শান্ত হয়ই নি, বরং গৃহে ফিরে কল্লাটের অনুপস্থিতির সংবাদ তাকে আরো উৎকণ্ঠিত, আরো চঞ্চল করে তুলেছিল। ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল কমলা। তারপর কল্লাটের আহত অভিমানের সংযত প্রকাশে কমলার মন দ্বিগুণ আকৃষ্ট হয়ে ছিল তার প্রতি।

কল্লাট নিজেই বলেছে, সে ক্ষত্রিয়, অস্ত্রজীবী। সে যে কোন ছদ্মবেশী অতি উচ্চবংশসম্ভূত, তাতে সন্দেহ নেই।

গতরাত্রে আহারাদির পর কমলা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে নি। কম্পিত পায়ে সে উপস্থিত হয়েছিল কল্লাটের শয়ন কক্ষে। তার জীবন, যৌবন, মন, সবই সে তখন বিদেশী অতিথির চরণে সমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত।

মৈরেয় পান করে কমলার চক্ষু ঈষৎ রক্তাভ। কমলার আচরণে, কমলার দৃষ্টিতে আসঙ্গ লিপ্সার বাসনা প্রকট।

কমলার চিত্তবৈকল্য আগেই বিদেশী অতিথির লক্ষ্য এড়ায় নি। সে কেবল শস্ত্রজ্ঞ আর সঙ্গীতজ্ঞই নয়। রমণীর মন বুঝতেও অভিজ্ঞ।

আবেগবিহ্বল মুখে, স্খলিত চরণে কমলা গভীর নিশীথে উপস্থিত হয়েছিল কল্লাটের শয়ন কক্ষে। উপবেশন করেছিল কল্লাটের স্বুধর্ণ পালঙ্কে, কল্লাটের পদপ্রান্তে। পরম আবেগে তার দেহলতা কম্পিত হচ্ছিল। সে জানতো না যে কল্লাট নিদ্রিত নয়।

তাকে দেখে কি যেন চিন্তা করলো কল্লাট। দ্রুত চিন্তা।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর—অঙ্গুরীশোভিত হাতে পালঙ্কের সুবর্ণময় কারুকার্যের উপর মৃদু মৃদু করাঘাত করতে করতে কল্লাট অনুচ্চ কণ্ঠে স্বগতোক্তি করার মতো বলে চললো, 'যে মনস্বীর জিগীষার শান্তি হয় নি, তার রমণী বিষয়ক কোন ভাবনা শোভা পায় না। যেমন দেখ, সূর্যদেব জগৎ সংসারকে কিরণ দানে সন্তাপিত করে তবেই সন্ধ্যা-দেবীর ভজনা করেন।'

কল্লাটের অনুচ্চ কণ্ঠের স্বগতোক্তি শুনে সম্বিৎ ফিরে পেলো ভাব-বিহ্বলা কমলা। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করে, উঠে দাঁড়ালো পালঙ্ক থেকে। নিজের চিত্তচাঞ্চল্যের এমন নির্লজ্জ প্রকাশে লজ্জায়, ক্ষোভে, অবনত মুখে কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত হলো দেবনটী।

পালঙ্ক থেকে ত্বরিতে উঠে গমনোদ্যতা কমলার গতিরোধ করলো কল্লাট। গাঢ় আলিঙ্গনে কমলাকে বদ্ধ করে, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো, 'পদ্মপলাশলোচনা কমলা! সত্যই তুমি আমার চিত্ত হরণ করেছো। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ না করে আজ তোমাকে যে মনোকষ্ট, মর্মব্যথা দিচ্ছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করো। মিলনের সময় এখনও আসে নি। এই জন্যই তোমাকে এখন প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছি।'

কমলা তার কোমল অধর দংশন করে অশ্রুবেগ সংবরণের চেষ্টা করছিল, এবার বাঁধভাঙা বন্যার মতো চোখের জল নামলো তার মসৃণ কপোল বেয়ে।

কমলার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি তার নিজের বুকের উপর তুলে ধরে কল্লাট। অস্ফুট কণ্ঠে যেন আপন মনে উচ্চারণ করে, 'প্রিয়-দর্শিনী কমলা, আমি তোমার গুণমুগ্ধ, অনুগত। কিন্তু বর্তমানে

আমার কিছু কাজ শেষ না হলে আমি কোন সুখভোগের চিন্তাও করতে পারছি না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো, মানিনী। আমার সব কথাই শীঘ্রই বুঝতে পারবে তুমি।' কল্লাটের দেহ আবেগে স্পন্দিত।

কমলা এতদিন কেবল কল্লাটের রূপমুগ্ধ ছিল। পরে সে জেনেছে কল্লাট উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়। এখন সে উপলব্ধি করলো, কল্লাট অতি মহৎ ব্যক্তিও বটে। গভীর শ্রদ্ধায় মন ভরে গেলো তার। প্রত্যাখ্যাত মানিনী ফিরে এলো নিজের শয়ন কক্ষে। কিন্তু আহত সর্পিণীর মতো ক্রুদ্ধ হয়ে নয়, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর চোখ মেলেই গতরাত্রের কথা প্রথমেই মনে পড়লো, কমলার। যুগপৎ লজ্জায় আর হর্ষে তার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হলো। মনে মনে দেবতার আসনে বসালো সে কল্লাটকে।

মাধবী এলো তার শয়ন কক্ষে।

'দেবী, এবার শয্যা ত্যাগ করুন। আপনার প্রভাতী প্রসাধনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। প্রিয় পারাবতগুলি শস্যের আশায় আপনার গৃহ-অঙ্গন মুখর করে তুলছে।'

'চলো সখি, চলো। আজ বড় বিলম্ব হয়ে গেছে।' শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় কমলা।

গবাক্ষ পথে প্রভাতের শীতল বাতাস তার চোখে মুখে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেলো। কমলার তাপিত প্রাণ শান্ত হলো। কক্ষান্তরে যাবার জন্য গমনোদ্যত হলো সে। কিন্তু কি ভেবে সে মুখ ফিরিয়ে মাধবীকে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'মাধবী, আর্য কল্লাট কি করছেন?'

—'দেবী, তিনি প্রত্যূষেই নগর পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন, আপনাকে জানিয়ে দিতে বলে গেছেন। আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করতে চান নি তিনি।'

কমলা সামান্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

কল্লাটের সামনে দাঁড়াতে তার কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল।

স্নান, প্রসাধন, সবই সেদিন সারা হলো কমলার। কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে।

গত রাত্রের কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল তার।

আবার কল্লাটের মহত্ত্ব আর চারিত্রিক দৃঢ়তায় মুগ্ধ, বিস্মিত হয়ে পড়েছিল সে।

কে এই বিদেশী!

দেবতুল্য অসামান্য রূপ! অসাধারণ সংযম! যেন কি এক পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনে কৃতসঙ্কল্প হয়েছে কল্লাট।

আচ্ছা, ওর নাম কি সত্যই কল্লাট?

নাম যাই হোক, এ বিদেশী কমলার মন প্রাণ সবই হরণ করেছে।

'কি চিন্তা করছেন, দেবী? আপনাকে আজ বড় অন্যমনা দেখাচ্ছে।' মাধবী অনুযোগ করে। 'স্নান, প্রসাধান, আহার—কিছুতেই যেন রুচি নেই আপনার। আপনার শরীর সুস্থ আছে তো?'

'হ্যাঁ সখি। আমি সম্পুর্ণ সুস্থ। তোমার উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই।' মৃদু হেসে মাধবীকে আশ্বাস দেয় কমলা। 'আজ বরং আমাকে শীঘ্র দেবমন্দিরে যাবার জন্য প্রস্তুত করে দাও।'

কমলা আজ সারাদিন কল্লাটের কাছ থেকে সরে থাকতে চায়! তার মতি বিভ্রমের জন্য সে মুখ দেখাতে পারছে না কল্লাটকে। কিন্তু কল্লাটও তো এই দেবনর্তকীর প্রেমকে অস্বীকার করতে পারে নি! তবুও, এক মানসিক সঙ্কোচ কমলাকে অভিভূত করে।

॥ উনিশ ॥

সেদিন দেবমন্দির-প্রাঙ্গণের নৃত্যগীতের আসর থেকে ইচ্ছা করেই বিলম্ব করে গৃহে ফিরলো কমলা।

কল্লাট যদি ফিরে থাকে, তাহলে তার আহারাদি আপ্যায়ন শেষ হলেই ভালো।

মাধবীকে আজ সঙ্গে নিয়ে আসে নি সে স্কন্দমন্দিরে। তাকে গৃহেই রেখে এসেছে মাননীয় অতিথির পরিচর্যা করবার জন্য।

শিবিকা থেকে নেমে ধীর পায়ে গৃহপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায় কমলা। সেখানে সে দেখতে পেলো মাধবীকে। উৎকণ্ঠিত মুখে মাধবী প্রতীক্ষা করছে।

কমলাকে দেখে মাধবী ব্যগ্র কণ্ঠে বলে উঠলো, 'দেবী, আপনি ?' তার চোখে মুখে অস্বস্তি।

—'কি হয়েছে মাধবী ? আর্য কল্লাটের আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয় নি তো ?'

'দেবী, আমি ভেবেছিলাম আর্য কল্লাট দেবমন্দিরে গেছেন, আপনার সঙ্গীত শ্রবণ করবার জন্য', মাধবী বলে ওঠে।

—'আর্য কল্লাট ? কই—না তো ! কেন ? তিনি কি এখনও গৃহে ফেরেন নি ?' ব্যস্ত হয়ে ওঠে কমলা। 'কখন গৃহের বাইরে গেছেন তিনি ?'

'দেবী, আমাকে মার্জনা করবেন', নম্র গলায় বলে মাধবী। 'সন্ধ্যার আগে আর্য কল্লাট বসে ছিলেন এই অঙ্গনের মর্মর বেদিকায়। আমি গৃহকার্যে অন্তরালে গিয়েছিলাম। তখনই তিনি কোথায় চলে গেলেন। দ্বারের প্রহরীও তো আমাকে তাই জানিয়েছে।'

'মাধবী, দেখতো আর্য কল্লাটের শয়ন কক্ষে তাঁর উষ্ণীষ আর তরবারি আছে কিনা ?' উৎকণ্ঠিত কমলা প্রশ্ন করে।

মাধবী দ্রুত পায়ে চলে যায় গৃহাভ্যন্তরে।

অনতিবিলম্বে ফিরে এসে সে জানালো—আর্য কল্লাটের উষ্ণীষ কটিবন্ধ আর তরবারি—কিছুই নেই তার শয়ন কক্ষে।

মাধবীর কথায় অঙ্গনের প্রস্তর বেদিকার উপর উপুড় হয়ে পড়লো কমলা।

উচ্ছ্বসিত অশ্রুর বেগ সম্বরণ করতে পারে না সে।

'হায় আর্য কল্লাট! তুমি কি আমার গতরাত্রের চিত্তচাঞ্চল্যের জন্য ক্রুদ্ধ হয়েছ? হায়, অভাগিনী দেবনটী! তোমার আবেগবিহ্বলতা সংযত করতে পারলে না?' নিজেকে বারবার মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগলো কমলা।

ছি, ছি, আর্য কি না কি মনে করেছেন তার প্রগলভতা দেখে! কমলা, তুমি সামান্য দেবনর্ত্তকী হয়ে আকাশের চাঁদ ধরতে চেয়েছো? তোমার স্পর্ধা, তোমার আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত শাস্তি তুমি পেয়েছো।

ভাবতে ভাবতে কমলার মুখ করুণ হয়ে গেলো।

মাধবী কাতর মুখে দাড়িয়ে রইলো কমলার পাশে।

কমলার আননে অধীর ব্যাকুলতার অভিব্যক্তি দেখে সেও ব্যথিত, কিন্তু নিরুপায়।

একবার সে ডাক দিলো কমলাকে, 'দেবী, উঠুন। চলুন গৃহের অভ্যন্তরে।'

কমলা কোন উত্তর দিলো না। মাথা নত করে পড়ে রইলো পাষাণ বেদিকার উপরে। কেবল মাঝে মাঝে শোনা গেলো তার অস্ফুট ক্রন্দনের ধ্বনি।

নিরুপায় মাধবী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তার পাশে। চিত্র-পুত্তলিকার মতো।

রাত্রির প্রথম যাম উত্তীর্ণ হয়ে গেলো।

কল্লাট তখনও ফিরলো না।

অভিমানিনী কমলা অস্ফুট কণ্ঠে বলতে লাগলো, 'হায়, আমি কেন

জানালাম তাঁকে—আমার মনোবাসনা? হয় তো তিনি সেই জন্যই পরিত্যাগ করে গেলেন আমাকে।'

অন্য দাসদাসীরাও বিমর্ষ মুখে মাননীয় অতিথির প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু মহাসিংহের অত্যাচারে উৎপীড়িত নগরীতে মধ্য-নিশায় কেউই গৃহের বাইরে যেতে সাহসী হচ্ছিল না।

এমন সময় দ্বাররক্ষীর লক্ষ্য পড়লো, আর্য কল্লাট ক্লান্ত পায়ে এসে দাঁড়ালেন রুদ্ধ গৃহদ্বারের সামনে।

ত্বরিতে দ্বারের অর্গল মোচন করলো দ্বাররক্ষী।

চতুরিকা আর মঞ্জরী—দুই পরিচারিকা ছুটে এসে সংবাদ দিলো, 'দেবী, আর্য কল্লাট ফিরে এসেছেন।'

জ্যা মুক্ত তীরের মতো চকিতে উঠে বসলো কমলা। 'আর্য কল্লাট ফিরেছেন? কোথায় তিনি?' বলেই যেন তার স্বর রুদ্ধ হলো।

—'দেবী, এই যে আমি। তোমার চিন্তার কারণ ঘটিয়েছি বলে আমি দুঃখিত।'

ক্লান্ত পায়ে, এই কথা বলতে বলতে অঙ্গনে এসে দাঁড়ালো কল্লাট। তার বেশবাস অবিন্যস্ত। কপালে স্বেদবিন্দু। সারা দেহ ঘর্মাক্ত।

কটিবন্ধে তরবারি। মাথায় উষ্ণীষ।

কল্লাট বড় পরিশ্রান্ত। তার বাহুতে, বক্ষে ক্ষতচিহ্ন। রক্ত জমে গেছে সেখানে।

—'আর্য! আপনি আহত হয়েছেন?' ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে কমলা স্পর্শ করে কল্লাটের বাহু। 'আপনার দেহে ক্ষতচিহ্ন! আপনি কি আক্রান্ত হয়েছিলেন? কোন দস্যু তস্কর—?'

—'না দেবী, দস্যু তস্কর নয়। বলতে পারো রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়েছে।'

স্নিগ্ধ দৃষ্টি কমলার মুখের পরে নিবদ্ধ রেখে, পরিহাসতরল কণ্ঠে বলে ওঠে কল্লাট, 'এ অতি সামান্য ক্ষত, কোন চিন্তা নেই।'

তার কথায় কর্ণপাত করলো না ব্যাকুলা কমলা। এত উৎকণ্ঠার

মধ্যেও আর্য কল্লাটের 'তুমি' সম্বোধন তার কানে বেজেছে বীণার মধুর সুরঝঙ্কারের মতো।

—'আর্য, আপনি বিশ্রাম করবেন চলুন', ব্যস্ত হয়ে ওঠে কমলা।

কল্লাটের সঙ্গে সঙ্গে গৃহের অভ্যন্তরে যেতে যেতে সে পরিচারিকাদের ডাকাডাকি শুরু করে।

'মাধবী, মঞ্জরী, তোরা ভৃঙ্গারে জল নিয়ে আয়। চতুরিকা, তুই নিয়ে আয় ভেষজ পেটিকা।'

তারপরে কল্লাটের উদ্দেশে অন্তরঙ্গভাবে বললো, কমলা, 'আর্য, চলুন, আপনার শয়ন কক্ষে।'

কল্লাটের কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ গ্রাহ্য করে না কমলা।

তাকে শয্যায় বসিয়ে, নিজের হাতে পরিষ্কার করে দেয় তার ক্ষত-চিহ্নগুলো, সযত্নে লাগিয়ে দেয় ভেষজ অনুলেপন।

'এ ক্ষতগুলি পশুর নখের আঘাত বলে মনে হচ্ছে। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, আর্য?' প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে কমলা।

'গিয়েছিলাম এ নগরীকে ত্রাসমুক্ত করতে, পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর ভীতি দূর করতে'—রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে কথা শেষ করে কল্লাট।

কল্লাটের দক্ষিণ বাহুতে একটি বড় ক্ষতচিহ্ন। অনেক রক্ত ঝরেছে সেখান থেকে, স্পষ্ট বোঝা যায়। ক্ষতটি পরিষ্কার করতে করতে একবার কল্লাটের মুখের দিকে তাকায় কমলা। কল্লাটের মুখে প্রফুল্ল হাসি, কোন যন্ত্রণার চিহ্ন নেই।

ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে অনুলেপন লাগাবার সময় কমলার মনে হলো—সে হাতের রত্নখচিত কেয়ূরটি নেই তো।

চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করে সে দেখে নিলো বাম হাতের কেয়ূর রয়েছে যথাস্থানে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করলো না কমলা।

অনুলেপন দেওয়া শেষ হলে, কল্লাটের জন্য দাসীদের আহার্য আনবার আদেশ দিলো।

—'আর্য, আপনি ক্লান্ত। এবার বিশ্রাম করুন। এই ঔষধটি

আহারের পর পানীয় জলের সঙ্গে মুখে দিন, সুনিদ্রা হবে। শরীরে কোন গ্লানি থাকবে না।'

কমলার সেবাযত্নের আন্তরিকতায় কল্লাট মুগ্ধ। আহারের পর কল্লাটের কোন প্রতিবাদে কর্ণপাত করলো না কমলা। নিজেই কল্লাটের পদ সংবাহন করতে বসলো। 'আর্য, আপনি পরিশ্রান্ত। নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান।' মধুর কণ্ঠে অনুনয় করলো, কমলা।

ধীরে ধীরে চোখ বুজে এলো কল্লাটের।

কল্লাট ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে, উঠে দাঁড়ালো কমলা।

তারপর নতজানু হয়ে শয্যার পাশে বসে চুম্বন করলো কল্লাটের পা দু'খানি। দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়লো কল্লাটের পায়ের উপর।

স্কন্দমন্দির থেকে ফিরে আজ বেশভূষা পরিবর্তন করে নি কমলা। অঙ্গনের প্রস্তর বেদিকার উপর বসে কল্লাটের প্রতীক্ষা করছিল সে।

এখন সেই মহার্ঘ বস্ত্রাঞ্চল দিয়েই কল্লাটের পায়ের উপর থেকে ঝরে পড়া অশ্রুবিন্দু মুছিয়ে নিলো সে। তারপর প্রদীপের শিখা কমিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো কল্লাটের কক্ষ থেকে।

কল্লাট চক্ষু মুদেছিল বটে, কিন্তু ঘুমায় নি। জেগেই ছিল।

কমলা তার কক্ষ ত্যাগ করবার পর চোখ মেললো সে।

কমলার ভালোবাসার এমন সরল আন্তরিক প্রকাশে কল্লাট অভিভূত।

সত্য, কি বিচিত্র রমণীর মন! জীবনে অনেক রমণী সে দেখেছে।

কিন্তু কমলাকে যতই দেখছে, ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে।

এ নারী তার কাছে কি প্রত্যাশা করে? প্রেম?

অথচ সে অপরিচিত বিদেশী, পরিচয় গোপন রেখেছে।

তার আশ্রয়হীন, বন্ধুহীন, লক্ষ্যহীন জীবনে কমলা যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

পরিচয়হীন বিদেশীকে সে আশ্রয় দিয়েছে, দিয়েছে মহার্ঘ বসন। আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রাখে নি।

বিনিময়ে কল্লাট তাকে কি দিয়েছে?

কিছুই না। কেবল আশ্বাস দিয়েছে। এমন কি আত্মপরিচয়ও এখনও দেয় নি।

কবে সফল হবে তার স্বপ্ন? কি ভাবে সে অগ্রসর হবে লক্ষ্যের পথে!

এ নারীকে সে যতই দেখছে, ততই মুগ্ধ হচ্ছে। মধুরস্বভাবা, প্রিয়বাদিনী, প্রিয়দর্শিনী, অতিথি-পরায়ণতারও তুলনা নেই। কল্লাটের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সর্বদাই তার সজাগ দৃষ্টি। ইষ্টদেবতাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে সে বহুবার। এ নারী তার জীবনে দৈবপ্রেরিত।

এক একবার মনে হয়েছে কাশ্মীরনৃপতির সেই প্রয়াগের জ্যোতিষী শিবমিশ্রের কথা। তার সৌভাগ্য উদয় কি এ নারীকেই ঘিরে? হতে পারে, কারণ কমলা এ নগরীর প্রধানা দেবনর্তকী। অভিজাত পুরুষ মাত্রেই তার পরিচিত। স্বয়ং পুণ্ড্রবর্ধনরাজের সে স্নেহধন্যা!

কিন্তু রমণীর পরিচয়সূত্র ধরে রাজসকাশে যাবার চিন্তায় তার আত্মশ্লাঘাতে লেগেছে। অবশ্য তার ভাগ্যে কি আছে, তা জানেন কেবল দেবতারাই!

ভাবতে ভাবতে গভীর ঘুমে তার চক্ষু জুড়ে এলো।

গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলো কল্লাট।

সে রাতে পুণ্ড্রবর্ধনের নাগরিকেরা আর সিংহের গর্জন শুনতে পায় নি।

॥ কুড়ি ॥

—'কাশ্মীর-অধিপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড়! আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

কোন বিস্মৃতির অতল থেকে উচ্চারিত হচ্ছে কথাগুলি!

স্মৃতির তন্ত্রীতে বারবার অনুরণিত হচ্ছে সেই কথাগুলি।

একি স্বপ্ন? মায়া? না বাস্তব?

—'মহারাজ বিনয়াদিত্য জয়াপীড়—'

না, এতো স্বপ্নও নয়, মায়াও নয়!

ধীরে ধীরে চোখ মেললেন, জয়াপীড়।

কে তাঁকে এই নামে সম্বোধন করে! এ কণ্ঠস্বর তাঁর খুবই পরিচিত। আবার কানে আসে এক সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সম্ভাষণ—

—'মহারাজ বিনয়াদিত্য জয়াপীড়ের জয় হোক।'

এবার সব আলস্য, জড়তা ত্যাগ করে শয্যার উপরে উঠে বসলেন, জয়াপীড়।

আজ নিদ্রাভঙ্গ হতে বেশ বেলা হয়ে গেছে।

বাতায়নপথে শয্যার উপরে এসে পড়েছে প্রখর সূর্যালোক।

—'মহারাজ বিনয়াদিত্য জয়াপীড়, আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

শয্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কমলা। যুক্তকরে নতমস্তকে। তার পিছনে সসম্ভ্রমে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী, মঞ্জরী, চতুরিকা এবং কমলার অন্যান্য দাসদাসীরা।

'মহারাজ'! দ্বিধাকম্পিত স্বরে বলে ওঠে কমলা, 'আপনার পরিচয় আগে জানা ছিল না। অধীনার গৃহে আতিথ্য নেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আপনি অতি মহৎ। সে অনুরোধ

রক্ষা করে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। মূঢ় দেবনটীর স্পর্ধা ক্ষমা করবেন, কাশ্মীরপতি।'

কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড় ধীরে ধীরে শয্যা ছেড়ে উঠলেন। নতমুখী কমলার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

একটি হাত রাখলেন তার কাঁধে, অন্য হাতে তুলে ধরলেন তার নত মুখখানি।

—'কমলা, তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। কিন্তু আমার পরিচয় তুমি জানলে কি করে?'

কমলা সসম্ভ্রমে উত্তর দেয়, 'আপনি মহাসিংহ বধ করে নগরবাসীদের বিপদমুক্ত করেছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। স্বয়ং কাশ্মীরনাথ আমার গৃহে আতিথ্য নিয়ে, এ গৃহ ধন্য করেছেন। আমি কথা বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।'

জয়াপীড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ক্লিষ্ট হাসি হেসে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, আমিই কাশ্মীরের রাজ্যহারা হতভাগ্য নৃপতি বটে। কিন্তু, আমার প্রশ্নের উত্তর তুমি দাও নি কমলা। আমার পরিচয় তোমরা জানলে কি করে?'

—'মহারাজ! আপনি যে পুণ্ড্রবর্ধন নগরীতে অবস্থান করছেন, এ সংবাদ এ নগরীর কোন নাগরিকেরই আর অজানা নেই।'

জয়াপীড় সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন কমলার মুখের দিকে। দেখলেন, কমলার পদ্ম-আঁখিতে বিষাদ আর হর্ষের ছায়া।

—'মহারাজ।' জয়াপীড়ের মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরালো না কমলা।

'গতরাতে আপনি ক্লান্ত দেহে ফিরলেন আমার গৃহে। আপনার বক্ষে, বাহুতে পশুর নখরচিহ্ন, দেহ রক্তাক্ত। আপনার পরিচর্যা করার সময় আপনার দক্ষিণহস্তের কেয়ুরখানি দেখতে পাই নি। আমি প্রশ্ন করলাম—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন। তার উত্তরে আপনি বলেছিলেন—নগরীর ত্রাস দূর করতে গিয়েছিলাম।'

কমলার কথা শুনে চকিতে একবার নিজের শূন্য দক্ষিণ হাতের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে দেন জয়াপীড়। সত্যই সে হাতের কেয়ূরখানি নেই। কেয়ূরশূন্য হাত।

স্মিত হেসে বলে উঠলেন কাশ্মীরপতি, 'অতঃপর ?'

—'আজ প্রত্যূষে মহাসিংহের মৃত শরীর দেখে পুরবাসীরা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। পুরপাল স্বয়ং এসে সিংহের দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা রত্নখচিত কেয়ুরখানি উদ্ধার করেছেন। মণিখচিত কেয়ুরে—কাশ্মীর রাজবংশের লাঞ্ছন আর আপনার নাম দেখে পুণ্ড্রবর্ধনবাসীরা স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং ভীত হয়ে পড়েছিল।'

'কেন প্রিয়দর্শিনী ? আমি কি এতই ভীতিপ্রদ ?' সহাস্যে প্রশ্ন করেন, বিনয়াদিত্য জয়াপীড়।

সামান্য দ্বিধা করে কি যেন উত্তর দিতে গিয়েও নীরব হলো কমলা।

—'প্রিয়দর্শিনী কমলা, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি। বলতো, এ নগরে আমার উপস্থিতির কথা জানতে পেরে, নগরবাসী এত ভীত, চকিত কেন ? আমি কি এতই ভীতিকর ?'

'মহারাজ বিনয়াদিত্য জয়াপীড়, পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্ত হয় নি, আপনার পিতামহ কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় জয় করেছিলেন এ দেশ। আর—' কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে কমলা মাথা নত করলো।

'জানি কমলা। তোমার বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। সঙ্কোচ হচ্ছে আমারও।' জয়াপীড় বলে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠলো।

'ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম যাঁর, সেই ললিতাদিত্য গৌড়পতিকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ জানিয়ে গুপ্তঘাতকের হাতে নিধন করিয়েছিলেন। সেইজন্যই পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী আজ—এ নগরীতে কাশ্মীরপতি জয়াপীড়ের উপস্থিতির কথায় ভেবে ভীত হয়ে পড়েছে।' কথার শেষে কাশ্মীর-পতির স্বরে আহত ক্ষোভের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

জয়াপীড়ের কথার আর কোন উত্তর দিলো না কমলা।

এক বিদেশী অতিথির পরিবর্তে স্বয়ং কাশ্মীরনাথের আপ্যায়নের জন্য সে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

দাসদাসীদের ডাক দেয় কমলা। তারা ত্রস্ত হয়ে কাশ্মীরপতির সেবা ও পরিচর্যায় রত হয়।

কাশ্মীরপতিকে একটি সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত গজদন্তের আসনে বসিয়ে নিজের হাতে সসম্ভ্রমে তাঁর হাতে খাদ্য এবং পানীয় তুলে দিতে লাগলো কমলা।

এমন সময় সকলের কানে এলো রাজপথে ঘোষকেরা উচ্চ কণ্ঠে কি যেন ঘোষণা করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে।

'কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড়—' নামটি কানে যেতে বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন জয়াপীড়। তাঁর পিছনে কমলাও গিয়ে দাঁড়ালো।

শোনা গেলো ঘোষকেরা বাদ্য সহকারে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে— 'শোনো শোনো পুণ্ড্রবর্ধনবাসী, কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড় বর্তমানে এ নগরেই অবস্থান করছেন। মহাসিংহ বধ করে নগরীকে ত্রাসমুক্ত করেছেন তিনি। মৃত সিংহের মুখে পাওয়া গেছে তাঁর মণিময় কেয়ূর। যে ব্যক্তি রাজা জয়ন্তকে তাঁর সন্ধান দিতে পারবেন, রাজা তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করবেন। কাশ্মীরপতিকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পুণ্ড্রবর্ধনরাজ প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন।'

বাতায়নের কাছে দাঁড়িয়ে ঘোষণা শুনলেন জয়াপীড়।

সূক্ষ্ম বিচিত্র হাসি লেগে রইলো তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে।

তিনি চোখ ফেরালেন কমলার দিকে। দেখলেন, দেবনর্তকীর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ তাঁরই মুখের উপর। কমলার চোখে জল। সেই সঙ্গে কি আরও কিছু দেখলেন কমলার মুখমণ্ডলে, কমলার সমস্ত অবয়বে!

কম্পিত স্বরে কমলা কথা বললো। 'মহারাজ, আজ প্রত্যূষেই সিংহবধের সংবাদ শুনে আর আপনার নামাঙ্কিত কেয়ূর দেখে পুণ্ড্রবর্ধনরাজ আপনাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হয়েছেন।

এই সংবাদ ঘোষণা করতে করতে ঘোষকদল নগরীর পথে বেরিয়ে পড়েছিল। আপনার নিদ্রাভঙ্গের আগেই, এ ঘোষণা আমার কানে গিয়েছিল।'

—'হ্যাঁ কমলা, আমি দীর্ঘ সময় ঘুমিয়েছি। তুমি গত রাতে আমাকে নিদ্রা-আকর্ষক ঔষধ দিয়েছিলে। দেখ, শয্যা ত্যাগে কত বেলা হয়ে গেছে আজ।'

'মহারাজ, আমাকে মার্জনা করবেন—' বলতে বলতে আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হলো কমলার। 'আপনার নিদ্রাভঙ্গের আগেই এ ঘোষণা আমার কানে গেছে। আমি তাই সঙ্গে সঙ্গেই রাজদ্বারে সংবাদ প্রেরণ করেছি যে আপনি ছদ্মবেশে আমার গৃহেই আতিথ্য নিয়েছেন।'

কথাগুলি বলতে বলতে কণ্ঠ ক্রন্দনের বেগে রুদ্ধ হয় কমলার। নত মুখ তুলে কমলা পদ্মপলাশের মতো তার দুটি চক্ষু মেলে ধরলো কাশ্মীরপতির মুখের দিকে।

ঈষৎ বিস্মিত এবং উত্তেজিত দেখাচ্ছিল জয়াপীড়কে। কিন্তু তিনি অটল গাম্ভীর্য নিয়ে কমলার কথা শুনছিলেন, কোন প্রশ্নই করলেন না।

'এবার রাজগৃহে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হবেন কাশ্মীর-অধিপতি!' কমলার চোখে জল, মুখে সূক্ষ্ম হাসির রেখা। 'পুণ্ড্রবর্ধনরাজ জয়ন্ত, তাঁর সভাসদ আর অমাত্যবর্গ নিয়ে শীঘ্রই আসছেন আমার গৃহে। পরম সমাদরে তিনি রাজপুরীতে নিয়ে যাবেন আপনাকে। এ সংবাদ আমাকে প্রেরণ করেছেন রাজা।'

আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা কমলার মুখে ফুটে ওঠে। সেই অবশ্যম্ভাবী মনস্তাপকে হৃদয়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে কমলা আর্তকণ্ঠে বললো, 'এবার রাজসভায় যাবার জন্য আপনাকে সাজিয়ে দিতে অনুমতি দিন আমাকে—।'

অদৃষ্ট কাকে কোন পথে কখন যে নিয়ে যায়! বিচিত্র রহস্যময়

হাসি ফুটে ওঠে জয়াপীড়ের ওষ্ঠপ্রান্তে। কেমন যেন বিচলিত আর অস্থির মনে হয় তাঁকে। একবার তাকালেন কমলার দিকে।

কমলা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে। সে দৃষ্টি স্নিগ্ধ নয়, অত্যন্ত করুণ।

কক্ষের দ্বারপ্রান্তে কয়েকজন পরিচারিকা দাঁড়িয়ে আছে কাশ্মীর-পতির নতুন বেশভূষা অলঙ্কারাদি নিয়ে।

অস্থির পদচারণা করে বাতায়নের কাছে দাঁড়ালেন কাশ্মীরনাথ।

বাইরে গ্রীষ্মের সকালের প্রখর রৌদ্র।

স্বগতোক্তির মত বলে চললেন রাজা জয়াপীড়, 'আমি বিনয়াদিত্য জয়াপীড়। কাশ্মীর থেকে অভিযানে বার হওয়ামাত্র শ্যালক জজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা করে ছিনিয়ে নিল কাশ্মীর সিংহাসন।'

কমলার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কণ্ঠে গভীর আন্তরিকতার স্পর্শ লাগিয়ে জয়াপীড় বলে উঠলেন, 'কমলা, তোমাকে বলেছিলাম আত্মপরিচয় দেবো যথা সময়ে। মনে আছে? শোনো এবার।'

কমলাকে নিয়ে একটি গজদন্তখচিত, বিচিত্রভাবে চিত্রিত কাষ্ঠাসনের উপরে কোমল শয্যার উপরে উপবেশন করলেন বিনয়াদিত্য। তার হাত ধরে গভীর স্বরে বলে উঠলেন, 'তখন কাশ্মীর রাজ্য আমার হস্তচ্যুত হলো। ভেবেছিলাম অন্যান্য সামন্তেরা আমাকে পিতৃসিংহাসন উদ্ধার করতে সাহায্য করবেন। তাঁরাও নানা কারণ দেখিয়ে অথবা বিনা কারণে ত্যাগ করলেন আমাকে। অবশিষ্ট সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এগিয়ে চললাম দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। তখন সেই সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও শত্রুর তৎপরতা দেখা দিলো। তারা দেশে ফেরবার জন্য ব্যস্ত হলো। তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে আদেশ দিলাম আমি।' ঈষৎ ক্ষুব্ধ সুরে কথা শেষ করলেন, জয়াপীড়।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল কমলা। বলে উঠলো, 'তারপর?'

'তারপর? তারপর আর কি কমলা? আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম মানবচরিত্রের কুটিলতা আর স্বার্থপরতা দেখে। সৈন্যরা ফিরে গেলো।

কিন্তু রয়ে গেলো তাদের অশ্বগুলি। সেগুলি কাশ্মীরের রাজমন্দুরার সুশিক্ষিত অশ্ব, এক লক্ষ অশ্ব। আর আমার সঙ্গে রয়ে গেলেন সেনাপতি দেবশর্মা। আমাদের বিশ্বস্ত প্রধান মন্ত্রী মিত্রশর্মার পুত্র, আমার চির-অনুগত বাল্য সহচর। আর্যাবর্তের সামন্তরাজরাও আমাকে নিরাশ করলেন।'

কমলার কোমল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন জয়াপীড়। তুলে নিয়ে কাশ্মীরপতি এক গভীর প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তার মুখের দিকে। কোন চিন্তার প্রভাবে কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন।

কমলাও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে শুনছিল। সুদূর কাশ্মীররাজ্য থেকে রাজ্যহারা নরপতি কিসের আশায়, কিসের আকর্ষণে চলে এসেছেন পুবদেশে, পুণ্ড্রবর্ধন নগরে? সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কাশ্মীররাজ বিনয়াদিত্যের দিকে।

বিনয়াদিত্য জয়াপীড় অনুচ্চ কণ্ঠে আবার বলে উঠলেন, 'দেবশর্মা আর অনুগত মুষ্টিমেয় সেনানী নিয়ে চলে এলাম প্রয়াগে। তারপর সব অশ্ব সেই পুণ্যতীর্থে দান করে অগ্রসর হলাম আরো পূবে। নাম নিলাম কল্লাট। এসে উপস্থিত হলাম পুণ্ড্রবর্ধন নগরীতে।'

জয়াপীড় একটু থেমে, স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে কমলার মুখটি তুলে ধরে বললেন, 'তুমি পরম করুণাময়ী। আমি হৃতসর্বস্ব অপরিচিত এক বিদেশী। এ নগরীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—আশ্রয়হীন, বন্ধুহীন, স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত। তুমি আমার আশ্রয়দাত্রী। তোমার ঋণ জীবনেও ভুলবো না আমি।'

এ কথা শুনেই কমলা ত্বরিতে জয়াপীড়ের দুটি হাত ধরে অনুনয় করে বলে উঠলো, 'আপনি আমাকে চির-ঋণী করেছেন, মহারাজ। আমার গৃহে আতিথ্য নিয়ে, আমাকে সাহচর্য দিয়ে আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা পাশেও বদ্ধ করে গেলেন, কাশ্মীরনাথ বিনয়াদিত্য! এর চাইতে সম্মান সামান্য দেবনটীর আর কি হতে পারে?'

কমলার চক্ষু সজল হয়ে এলো। আবেগরুদ্ধ স্বরে আবার বলে উঠলো, 'মহারাজ, আপনার জন্য অপেক্ষা করছে রাজসম্মান। সাড়ম্বর অভ্যর্থনা। পুণ্ড্রবর্ধনরাজ, পুণ্ড্রবর্ধন-নগরবাসী আপনাকে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত। কাশ্মীরপতি, মনে হচ্ছে আপনার হৃতগৌরব ফিরে পাবার শুভলগ্ন উপস্থিত!'

দাসদাসীদের হাত থেকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ নিয়ে কমলা নিজের হাতে সজ্জিত করে দিলো কাশ্মীরপতিকে। মূল্যবান আভরণ দিলো তাঁর গায়ে। পাদুকা দুটি পরিয়ে দিলো পরম যত্নে নিজের হাতে। কিন্তু তার চোখের অবাধ্য অশ্রু কোন বাধাই যেন মানছিল না। কিছুতেই অশ্রুবেগ সম্বরণ করতে পারছিল না, কমলা।

নির্বাক বিস্ময়ে কমলাকে লক্ষ্য করছিলেন কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড়।

তাঁর বেশভুষা সমাপ্ত হলে, তিনি গাঢ় স্বরে বলে উঠলেন, 'কমলা, তুমি কেবল আমাকে দিয়েই গেলে। আশ্রয় দিলে, দিলে ভালোবাসা। আমি তো তোমাকে কিছুই দিলাম না।'

'আপনি আমাকে দিয়ে যাচ্ছেন মহামূল্য স্মৃতি। সেই তো দেবনটী কমলার পরম প্রাপ্তি, মহারাজ! আপনার স্মৃতিই আমার চিরসম্বল।'

বাক রুদ্ধ হয়ে আসে কমলার। 'আপনার সৌভাগ্যসূর্য উদিত হচ্ছে, মহারাজ। যখন কাশ্মীরে ফিরে যাবেন, রাজকার্যের অবসরে— যদি কখনও মনে পড়ে কমলার কথা, তাতেই আমি ধন্য হবো। অস্ফুট কণ্ঠে বলে চলে, স্তব্ধ হয় সে ক্ষণিকের জন্য।

পুনরায় আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'আমার বাকি জীবন আপনার স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকবো। কেবলই আপনার স্মৃতি'—বলতে বলতে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো কমলা। আর আত্মসম্বরণ করতে পারলো না, লুটিয়ে পড়লো বিনয়াদিত্যের পায়ে।

সস্নেহে কমলার ভূলুণ্ঠিত দেহ নিজের বিস্তৃত বক্ষপুটে তুলে নিলেন, বিনয়াদিত্য জয়াপীড়। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে কমলার সুন্দর

মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আমার অভিলাষ পূর্ণ হলে, তোমার অভিলাষও অপূর্ণ থাকবে না, কমলা।'

কমলার প্রণয়বিহ্বল ও অশ্রুসজল নয়ন দুটিতে এক লহমার জন্য যেন খুশীর আমেজ ঝলমলিয়ে উঠলো।

॥ একুশ ॥

ঐদিন অতি প্রত্যুষে নগরের উপকণ্ঠে একটি বিশাল বৃক্ষের নীচে রক্তাক্ত মৃত সিংহের দেহ চোখে পড়েছিল একদল শ্রমজীবীর।

তারা চলেছিল নগর অভিমুখে, জীবিকার সন্ধানে।

কিছুটা সশঙ্কচিত্তে পথ চলছিল তারা। হয়তো এখনই চোখে পড়বে পশুরাজের রক্তপিপাসার বীভৎস দৃশ্য। হয়তো অর্ধভক্ষিত কোন হতভাগ্য মানুষের দেহ—অথবা মৃত গবাদি পশুর দেহ।

ভূলুণ্ঠিত মৃত পশুরাজকে দেখে তারা ভয়ে নির্বাক হয়ে গেলো প্রথমে। তারা ভেবেছিল যে মহাপশু বুঝি নিদ্রিত, এখনই সংহার-মূর্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের উপর। ত্রস্ত হয়ে ছুটে দূরে সরে গেলো তারা।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করবার পর—দুজন সাহসী শ্রমজীবী অস্ত্র হাতে এগিয়ে এলো। তারপর ভালো করে দেখে আনন্দে চীৎকার করে জানিয়ে দিলো অপেক্ষমান সঙ্গীদের, 'সিংহ মৃত! নগরীর ত্রাস মহাসিংহ মৃত!'

তাদের আনন্দের কোলাহলে আরো কয়েকজন শ্রমজীবী আকৃষ্ট হলো। তারাও সিংহকে মৃত দেখে, চারদিকে সেই বার্তা রটিয়ে দিতে দেরী করলো না। পুরপালকে সংবাদ দিতে ছুটলো কেউ কেউ।

অনতিবিলম্বে সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে পুরপাল উপস্থিত হলেন নগর-প্রান্তে। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন রক্ষী। অশ্ব থেকে অবতরণ করে, পুরপাল প্রশ্ন করলেন, 'কে বধ করেছে এই মহাসিংহ?'

নিহত সিংহের চারপাশে কৌতূহলী জনতার ভীড়।

একজন বৃদ্ধ শ্রমজীবী উত্তর দিলো, 'পুরপাল, এ সিংহকে কে বধ করেছে জানি না, তবে আমরাই এ মৃত পশুকে প্রথম লক্ষ্য করেছি।

জনতার ভিতর থেকে একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো, 'কে বধ করেছে এই মহাপশু, জানি না। তবে যেই করুক, আমাদের পরম উপকার করেছে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সিংহটাকে লক্ষ্য করতে করতে পুরপাল দেখতে পেলেন,—সিংহের বক্ষ ছুরিকার দ্বারা বিদীর্ণ। আর নতজানু হয়ে পরীক্ষা করার সময় দেখতে পেলেন, সিংহ সামান্য মুখ ব্যাদান করে আছে। তার করাল দাঁতের ফাঁকে কি যেন চকচক করে উঠলো, প্রভাতসূর্যের আলোয়।

পুরপাল সিংহের দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা বস্তুটা খুলে আনলেন। সবিস্ময়ে দেখলেন একটি মহামূল্য রত্নখচিত কেয়ুর। সম্ভবতঃ এটি যিনি সিংহ বধ করেছেন, তাঁরই অলঙ্কার। পশুরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় দৈবক্রমে আটকে গেছে—তার দাঁতের ফাঁকে। এ কেয়ুরটি তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে সচকিত হয়ে উঠলেন পুরপাল। তাঁর চক্ষু বিস্ফারিত হলো।

কেয়ুরের উপর সূর্যলাঞ্ছন। সেই সঙ্গে দেবভাষায় একটি নাম খোদিত—বিনয়াদিত্য জয়াপীড়।

দেখতে দেখতে রোমহর্ষ হলো পুরপালের।

সূর্যলাঞ্ছন তো কাশ্মীরের রাজবংশের প্রতীক!

আর বিনয়াদিত্য জয়াপীড়, গৌড়বিজয়ী ললিতাদিত্যের পৌত্র! কাশ্মীরের বর্তমান অধিপতি!

কি অদ্ভুত ঘটনা! কি বিচিত্র যোগাযোগ!

বিনয়াদিত্য জয়াপীড় কি এই পুণ্ড্রবর্ধন নগরীতে উপস্থিত হয়েছেন?

উপস্থিত হলে অবশ্যই ছদ্মবেশে এসেছেন। কিন্তু কেন?

বড়ই বিচিত্র ব্যাপার। এখনই সব ঘটনা রাজা জয়ন্তের কর্ণগোচর করতে হবে।

নগর রক্ষীদের সিংহের প্রহরায় রেখে, পুরপাল দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করলেন রাজসভা অভিমুখে।

॥ বাইশ ॥

পুরপালের মুখে সব সংবাদ শুনে বিস্ময়ে রাজা জয়ন্তের বাক রোধ হলো।

সভাসদবর্গ সচকিত। কিছুটা ভীত হয়েও পড়লেন তাঁরা।

কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড় এখন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীতে! তাঁরই হাতে নিহত হয়েছে নগরীর ত্রাস—ভয়ঙ্কর মহাসিংহ!

পুরপাল রত্নময় কেয়ুরখানি সসম্ভ্রমে তুলে দিলেন রাজা জয়ন্তের হাতে।

সেই রত্নখচিত কেয়ুরখানি বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলেন রাজা জয়ন্ত। তাঁর কপালে চিন্তার রেখা। কেয়ূরখানি তিনি তুলে দিলেন মহামন্ত্রীর হাতে।

অলঙ্কারখানি হাতে নিয়ে দেখলেন মহামন্ত্রী। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'এ প্রসঙ্গে একটি সংবাদ জ্ঞাপন করছি, রাজন। গত সন্ধ্যায় আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের গূঢ় পুরুষেরা সংবাদ এনেছে যে কাশ্মীরনাথ বিনয়াদিত্য জয়াপীড় প্রয়াগ ছেড়ে পাটলিপুত্রের অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন একাকী। এক পক্ষ কালের বেশি সময় পার হয়ে গেছে। তাঁর মিত্র এবং অনুরক্ত কাশ্মীরী সেনানায়ক দেবশর্মা একদল সৈন্য নিয়ে প্রয়াগে অবস্থান করছেন। আমাদের কাছে শেষ সংবাদ এসেছে, পাটলিপুত্র ছেড়ে ছদ্মবেশী কাশ্মীরপতি চলেছিলেন চম্পার দিকে।'

সভায় উপস্থিত সভাসদ ও অমাত্যগণের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ মন্ত্রী আবার ধীরে ধীরে বললেন, 'কাশ্মীরনাথ বর্তমানে প্রায় সহায় সম্বল-

হীন। কাশ্মীর-সিংহাসন অন্যায়ভাবে অধিকার করেছেন তাঁর শ্যালক জজ্জ, কাশ্মীরপতির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে। শোনা যাচ্ছে, কাশ্মীরপতি সামন্তরাজগণের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারেন। গৌড়ও তো কাশ্মীরের সামন্ত রাজ্য!'

এই বলে, মহামন্ত্রী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন চারপাশে। কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে বৃদ্ধ আবার বলে উঠলেন, 'এই রত্নময় কেয়ুর জানিয়ে দিচ্ছে, কাশ্মীরপতি এখন পুণ্ড্রবর্ধনে। তবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নি। সম্ভবতঃ এ রাজ্যে এসেছেন ছদ্মবেশে।'

'আমাদের এখন কি কর্তব্য?' রাজা জয়ন্ত প্রশ্ন করলেন। সভাসদদের মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া। তাঁরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্যের বিক্রম এখনও অনেকেই বিস্মৃত হন নি।

'মহারাজ! সর্বাগ্রে আমাদের একবার ঘটনাস্থলে যাওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।' বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রস্তাব করলেন।

'উত্তম কথা!' রাজা প্রস্তাবটি সমর্থন করে বললেন, 'সভাসদগণ, আপনাদেরও ঘটনাস্থলে যাওয়া প্রয়োজন।'

অতঃপর চতুরশ্ববাহিত রাজরথ প্রশস্ত রাজপথে ছুটে চললো।

সঙ্গে চললেন অমাত্য ও সভাসদবর্গ, নিজ নিজ বাহনে।

নগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলেন রাজা।

মৃতসিংহ ঘিরে রক্ষীরা দাঁড়িয়েছিল। অদূরে কৌতূহলী জনতা।

রাজার রথ দেখে তারা জয়ধ্বনি করলো। যুক্তকরে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে সসম্ভ্রমে সরে গেলো পুণ্ড্রবর্ধনবাসীরা। দূরে দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলো রাজা এবং তাঁর সভাসদদের।

রাজা জয়ন্ত রথ থেকে অবতরণ করে মৃত সিংহের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করেই বিস্ময়াহত হয়ে বললেন, 'এক আঘাতেই সিংহের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে! নিধনকারী অপরিসীম বলশালী!'

সভাসদগণ তাই শুনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেছিলেন। তাঁদের মুখ থেকে উদ্বেগের ছায়া অপসারিত হয় নি।

রাজা জয়ন্ত কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইলেন নগরীর ত্রাস মহাসিংহের মৃত দেহের দিকে। ধীরে ধীরে তাঁর মুখ থেকে উদ্বেগের ছায়া অপসারিত হলো। পরিবর্তে মুখে হাসির রেখা ফুটলো। মনে হলো, কি ভেবে তিনি যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করছেন।

তিনি দৃষ্টি ফেরালেন চারপাশে দণ্ডায়মান উৎকণ্ঠিত সভাসদদের দিকে। তাঁদের আশ্বাস দিয়ে রাজা জয়ন্ত উদ্বেগহীন কণ্ঠে বললেন, 'আপনারা অকারণে ভীত হয়ে পড়েছেন। নগরীর মহাত্রাস এই মহাসিংহকে যিনি বধ করেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে পুণ্ড্রবর্ধনের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি আমাদের বিপদমুক্ত করেছেন। আমরা তাঁকে পরমহিতৈষীর মতোই সমাদরে বরণ করে নিতে প্রস্তুত আছি।'

রাজার কথায় সাধুবাদ দিলেন সভাসদরা।

স্বস্তির হাসি ফুটলো বৃদ্ধ মন্ত্রীর মুখে।

রাজা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মন্ত্রীর দিকে।

মন্ত্রী মাথা নেড়ে স্মিত মুখে সম্মতি দিলেন।

তখন রাজা জয়ন্তের আদেশে অবিলম্বেই নগরীর চারধারে ছড়িয়ে পড়লো ঘোষকের দল

শোনো, শোনো, পুণ্ড্রবর্ধনবাসী। মহাসিংহের নিধনকারী কাশ্মীর-পতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড়কে পুণ্ড্রবর্ধনের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী রূপে বরণ করে নিতে রাজা জয়ন্ত প্রস্তুত। যে জন কাশ্মীরপতির সন্ধান দেবেন, রাজা তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করবেন। কাশ্মীরনৃপতির নামাঙ্কিত কেয়ূর পাওয়া গেছে মৃতসিংহের মুখে।

রাজা জয়ন্ত সপার্ষদ মৃত মহাসিংহ দর্শন করার জন্য নগরপ্রান্ত অভিমুখে যাত্রা করছিলেন যখন, তখন রাজপ্রাসাদেও আনন্দ-কোলাহল উঠলো।

পশুরাজের নিধনসংবাদে পুণ্ড্রবর্ধনবাসীমাত্রেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

এ বার্তা যেন পরম স্বস্তি, পরম আশ্বাসের বার্তা।

চিত্রমতিকা ছুটলো রাজনন্দিনীকে এ শুভ সংবাদ জানাতে।

কল্যাণদেবী তখন ইষ্টপূজা শেষ করেছেন।

তাঁর পরিধানে শুভ্র অলঙ্কৃত পট্টবস্ত্র। কপালে শ্বেত চন্দনের বিন্দু। কণ্ঠে প্রলম্বিত মুক্তার মালা।

রাজনন্দিনী যেন মূর্তিময়ী ঊষা।

'রাজকন্যা, শুনেছো এ আনন্দ বার্তা।' চঞ্চলা হরিণীর মতো ছুটে এসে বললো, চিত্রমতিকা, 'নগরী ত্রাসমুক্ত হয়েছে। মহাসিংহ নিহত!'

রাজকন্যা ছুটি মৃণাল বাহু যুক্ত কোরে প্রণাম জানালেন দেবতাকে। তার পর ছুটি বিশাল চক্ষু চিত্রমতিকার মুখে নিবদ্ধ করে, স্নিগ্ধ স্বরে মন্তব্য করলেন, 'সত্যই এ এক শুভ সংবাদ! আনন্দবার্তা। নগরীকে যিনি ত্রাসমুক্ত করেছেন, নগরবাসীর পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, তাঁর উদ্দেশে।'

একটি মধুর হাসির রেখা ফুটলো রাজনন্দিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানিতে। বীণানিন্দিত কণ্ঠে চিত্রমতিকার উদ্দেশে বললেন, 'সখি, জানো, অল্প আগে দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চনা করছিলাম আমি। মনে মনে প্রার্থনা জানাচ্ছিনাম, এমন বীর কি কেউ নেই—যিনি এ মহাপশুর অত্যাচার নিবারণ করে বিপদমুক্ত করতে পারেন নগরবাসীকে। দেবতা আমার প্রার্থনা শুনেছেন। কিন্তু, কে সেই বীর, যিনি এই পশুরাজকে বধ করেছেন?'

এমন সময় রাজপথে কোলাহল শোনা গেলো। দূরে যেন কি ঘোষণা চলেছে।

উৎসুক চোখে তাকালেন কল্যাণদেবী, চিত্রমতিকার দিকে।

—'এখুনি জেনে আসছি—কিসের এ ঘোষণা,' লঘুপায়ে রাজকুমারীর কক্ষ ত্যাগ করে ছুটে চললো চিত্রমতিকা।

॥ তেইশ ॥

কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড়কে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে কমলার গৃহে উপস্থিত হলেন, সপার্ষদ রাজা জয়ন্ত।

ব্যস্ত হয়ে রাজাকে যথোপযুক্ত মর্যাদায় নিজের গৃহে অভ্যর্থনা ও অভিবাদন জানালো কমলা।

'দেবনর্তকী কমলা! কাশ্মীরপতিকে তোমার গৃহে সমাদরে স্থান দিয়েছো তুমি। পুণ্ড্রবর্ধনের মান রক্ষা করেছো। তোমার গৃহে কাশ্মীরপতির আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয় নি, আমরা জানি।' সহাস্যে সম্ভাষণ করলেন, রাজা জয়ন্ত।

'রাজন! আজ প্রভাতের আগেও জানতাম না ইনি কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড়। আপনার ঘোষকের দল যখন ঘোষণা করলো, কাশ্মীররাজের নামাঙ্কিত রত্নময় কেয়ুর পাওয়া গেছে মৃতসিংহের মুখে, তখনই জানতে পেরেছি যে—যে বিদেশীকে আমার গৃহে আতিথ্য নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম—তিনিই কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড়। আমি সামান্য দেবনটী, আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি, রাজন।' যুক্তকরে নত মস্তকে বলে উঠলো, কমলা।

'কমলা, আজ প্রভাতে এই নগরে কাশ্মীরপতির উপস্থিতির সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু উৎকণ্ঠা ছিল, কি ভাবে, কোথায় তাঁর দর্শন পাবো। তোমার সংবাদবাহক যখন তোমার গৃহে কাশ্মীররাজের অবস্থানের সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলো আমার সভায়, আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না।' স্থিরভাবে বলে চললেন, রাজা জয়ন্ত। 'তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করেছ, তোমার অভিলাষও আমি অপূর্ণ রাখবো না। বল কমলা, কি তোমার প্রার্থনা?'

'মহারাজ! আমি ভাগ্যবতী। আজ প্রভাতেই রাজদর্শন পেলাম।

অধীনার গৃহে আপনি পদার্পণ করেছেন, এই তো আমার মহা সৌভাগ্য! কাশ্মীরপতি জয়াপীড় ছদ্মবেশে আতিথ্য নিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। আর কি অভিলাষ আমার থাকতে পারে?' সসম্ভ্রমে উত্তর দেয় কমলা।

—'কল্যাণ হোক তোমার, দেবনর্তকী। ভবিষ্যতে তোমার কিছু প্রয়োজন হলে, জানাতে দ্বিধা করবে না।' আশীর্বাদ করলেন জয়ন্ত।

অতঃপর কমলা সসম্মানে কাশ্মীররাজ বিনয়াদিত্য জয়াপীড়কে উপস্থিত করলেন পুণ্ড্রবর্ধনরাজ জয়ন্তের সামনে। দুই নরপতি পরস্পরকে যথোপযুক্ত অভিবাদন জানালেন। তরুণ কাশ্মীরপতির তেজোপূর্ণ বীরত্বব্যঞ্জক রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন রাজা জয়ন্ত।

প্রৌঢ় রাজা জয়ন্তের স্নিগ্ধ, সপ্রতিভ এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ আকৃতি দেখে মনে মনে প্রীত হলেন কাশ্মীরপতি।

অতঃপর রাজা জয়ন্ত এবং তাঁর সভাসদবর্গ বিনীতভাবে কাশ্মীরপতিকে অনুরোধ জানালেন, রাজসভায় যাবার জন্য।

কাশ্মীরপতি সম্মত হলেন।

জয়ন্ত তাঁকে পরম সমাদরে তুলে নিলেন নিজের রথে। চতুরশ্ব-বাহিত রথ এগিয়ে চললো রাজপ্রাসাদ অভিমুখে।

অপসৃয়মান রথের দিকে তাকিয়ে ছিল কমলা, গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে। তার পদ্ম-আঁখি দুটি জলে ভরে গেলো।

রথ চলে গেলো দৃষ্টির আড়ালে।

সেই সঙ্গে কমলার জীবনের অর্থও যেন শূন্য হয়ে গেলো!

দেবনর্তকী ত্রস্ত পায়ে ছুটে এসে লুটিয়ে পড়লো জয়াপীড়ের শূন্য কক্ষের শূন্য শয্যার উপরে।

এদিকে রাজপথের দুপাশে উৎসুক নরনারী রাজা জয়াপীড়ের নামে বারবার জয়ধ্বনি করতে লাগলো।

রাজপ্রাসাদের মূল তোরণে রথ প্রবেশ করা মাত্র পুরাঙ্গনারা শঙ্খধ্বনি করে উঠলো। পুষ্পবৃষ্টি করলো রথের উপর।

প্রাসাদশিখর থেকে শোভাযাত্রা নিরীক্ষণ করছিলেন রাজনন্দিনী কল্যাণদেবী। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল চিত্রমতিকা এবং অন্যান্য সখিরা।

প্রাসাদতোরণে রাজরথ প্রবেশ করতে, চিত্রমতিকা কল্যাণদেবীর অঙ্গ মৃদুভাবে স্পর্শ করে বললো, 'সখি! দেখ, দেখ, রথের উপর রাজা জয়ন্তের পাশে বসে আছেন কাশ্মীরপতি জয়াপীড়। আহা যেন সাক্ষাৎ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়! নাকি রতিপতি মদন?'

কল্যাণদেবীও নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন।

হঠাৎ কম্পিত হলো তাঁর বাম চক্ষু, স্পন্দিত হলো বাম অঙ্গ। রাজনন্দিনীর কপোল হয়ে উঠলো রাগরক্তিম। কণ্ঠ রুদ্ধ হলো অজানা আনন্দে।

মনে পড়ে গেলো গ্রহাচার্যের কথা।

রাজকন্যার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে গ্রহাচার্য বলেছিলেন, 'রাজপুত্রী, তোমার জীবনের পরম লগ্ন, তোমার বিবাহক্ষণ সমাগত। এক রাজচক্রবর্তী সম্রাট হবেন তোমার স্বামী। উত্তর দিকে হবে তোমার শুভ যাত্রা। তুমি হবে সুসন্তানের জননী।'

এর চাইতে শ্রেয় রমণীর জীবনে আর কিইবা থাকতে পারে? ভাবলেন রাজকন্যা।

তবে গ্রহাচার্য আরো কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। তা হলো—।

'কি হলো সখি? তুমি যে কাশ্মীরপতিকে দেখে চিত্রপুত্তলির মতো স্থির হয়ে গেলে?' পরিহাস করে ওঠে চিত্রমতিকা।

সখির পরিহাসে সম্বিৎ ফিরে পান, কল্যাণদেবী। ভ্রূ ভঙ্গি করে বলেন, 'তুই বড় প্রগলভা হয়ে উঠছিস্।'

রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে রাজা জয়ন্ত মাননীয় অতিথিকে নিয়ে গেলেন সভাগৃহে।

রাজসিংহাসনের পাশে মহামূল্য কারুকার্যশোভিত আসনে বসালেন কাশ্মীরপতিকে

তারপর সভাসদদের সম্বোধন করে বলে উঠলেন, 'আমাদের পরম সৌভাগ্য—কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড় আজ পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর অতিথি হয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি মহাসিংহ বধ করে নগরীকে বিপদমুক্ত করেছেন। তাই তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী।'

রাজা জয়ন্তের কথায় সভাসদগণ সাধুবাদ করলেন। উপস্থিত সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রাজা জয়ন্ত আবার বললেন, 'সভাসদগণ, আমাদের একথাও স্মরণ রাখা উচিৎ যে কাশ্মীরপতির প্রতি আমরা অনুগত। অর্ধশত বৎসরও পার হয় নি, গৌড়পতি গোপাল এই কাশ্মীরপতির পিতামহ বীর ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।'

রাজা জয়ন্ত সামান্য ক্ষণ থামলেন, সভাসদদের উপর তাঁর কথার কি প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখবার জন্য। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি সকলের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করলেন যে সভাগৃহে অস্বাভাবিক নীরবতা। রাজসভার পরিবেশ বিচিত্র এক উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায় ভারী হয়ে উঠছে।

আবার রাজা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বললেন, 'অবশ্য আজ কাশ্মীরপতি জয়াপীড় এসেছেন পুণ্ড্রবর্ধনের অতিথি রূপে, একাকী। তাঁর সঙ্গে আসে নি কোন বিজয়বাহিনী। কাশ্মীরপতি এবার দিগ্বিজয় করতে আসেন নি পুণ্ড্রবর্ধনে, এসেছেন পুণ্ড্রবর্ধন-নগরবাসীর হৃদয় জয় করতে। ঐ মহাভয়ঙ্কর দুরন্ত পশুরাজকে হত্যা করে, তিনি আমাদের পরম উপকার করেছেন, আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন। সভাসদগণ, আপনারা তাই পরম হিতৈষী বন্ধু রূপেই তাঁকে বরণ করে নিন।'

সভার শ্বাসরোধকারী পরিবেশ তরল হয়ে এলো রাজা জয়ন্তের কথায়। সকলে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন।

বৃদ্ধ মন্ত্রী অতি চতুরতার সঙ্গে বলে উঠলেন, 'রাজন, কাশ্মীর-

পতির সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধনের সখ্যতা অক্ষয় রাখা সকল দিক থেকেই সঙ্গত।'

জয়ন্ত প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, 'কাশ্মীর ও গৌড়ের সখ্যতার বন্ধন দৃঢ়তর করার জন্য আমি একটি প্রস্তাব করছি। আমার পুত্র নেই। আমার একমাত্র স্নেহের কন্যা কল্যাণদেবীকে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিনী করে তুলেছি। আমার একান্ত ইচ্ছা, রাজকন্যাকে কাশ্মীরপতির হাতে সম্প্রদান করি। এইভাবে তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিশোধ করতে পারি। আগেকার তিক্ত স্মৃতিকে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে, মুছে দিতে পারি। আপনারা কি বলেন?'

কূটনীতি-বিশারদ রাজা জয়ন্তের এই উদার রাজনৈতিক প্রস্তাবে রাজসভাগৃহে উপস্থিত সভাসদ ও নাগরিকবৃন্দ মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন। রাজা জয়ন্ত এবং কাশ্মীরনাথ জয়াপীড়ের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হলো রাজসভাগৃহ।

হর্ষধ্বনি থামলে পুণ্ড্রবর্ধনরাজ জয়ন্ত ঈষৎ আবেগে পুলকিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সভাসদগণ এবং নাগরিকবৃন্দ, আপনারা সকলেই জানেন, বহুমূল্য রত্ন সংগ্রহের জন্য রত্নদ্বীপে যেতে হয়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি স্বগৃহে বসেই এমন মহামূল্য রত্ন লাভ করে, সে কি সে রত্ন হস্তচ্যুত করে? তেমনই, এমন অন্বেষণীয় পাত্র যদি স্বয়ং উপস্থিত হন এ নগরীতে, তাহলে এর চাইতে সৌভাগ্য এবং আনন্দ আর কিছু নেই! কাশ্মীররাজ জয়াপীড় আমাদের বহুকাঙ্ক্ষিত অন্বেষণীয় পাত্র। তাঁর হাতে কন্যাকে সমর্পণ করার মতো আনন্দ আর কি আছে?'

আবার হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হলো চতুর্দিক।

কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য এই সুবর্ণ সুযোগটি নষ্ট করলেন না। যুক্তকরে সভাকে অভিনন্দন জানিয়ে আবেগময় কণ্ঠে বললেন, 'পুণ্ড্রবর্ধনরাজ, আপনারা আমাকে যেভাবে সম্মানিত করলেন, তার জন্য আমি নিজেকে ধন্য এবং পরম সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি

আমার হৃত রাজ্য উদ্ধারে গৌড়ের সহায়তা প্রার্থনা করি। আশা করি, আমি নিরাশ হবো না।'

বৃদ্ধ মহামন্ত্রী উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সাধু, সাধু, ধন্য কাশ্মীরপতি।'

অন্তঃপুরে বসে কল্যাণদেবীর বাম চক্ষু বার বার স্ফুরিত হলো। বাম অঙ্গ হলো স্পন্দিত।

লজ্জিত ও উৎচকিত রাজকন্যার কপালে চন্দনের মতো স্বেদবিন্দু ফুটে উঠলো।

॥ চব্বিশ ॥

'দেবী', মৃদুকণ্ঠে ডাকলো মাধবী।

কমলা কোন উত্তর দিলো না। মাধবীর ডাক তার কানেই পৌঁছায় নি ।

'দেবী কমলা'! আবার অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকে মাধবী।

এবার ধীরে ধীরে তার দিকে চোখ ফেরায় কমলা।

'দেবী, আপনার সান্ধ্য প্রসাধনের সময় হয়ে গেছে যে! স্কন্দমন্দিরে আজ বিশেষ নৃত্য ও গীতানুষ্ঠান আছে। আপনি মন্দিরে যাবেন কখন?' উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে মাধবী।

—'দেবমন্দিরে নৃত্য-গীতানুষ্ঠান? ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। চলো, চলো। সত্যই আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম যে।'

ত্বরিৎ পদে উঠে দাঁড়ায়, কমলা।

—'দাও মাধবী, আমার অলঙ্কারপেটিকা। চতুরিকাকে দুকুল বসন আনতে বলো'। কমলা বসলো সুবর্ণদর্পণের সামনে।

স্বামিনীর সাজসজ্জা সম্পূর্ণ করে দিতে দিতে উদগত অশ্রু গোপন করে মাধবী। কমলাকে সে সত্যই বড় ভালোবাসে। কমলার

অন্যমনস্কতা তাকে পীড়া দেয়। সাজ-প্রসাধনে দেবনর্তকীর এখন বড় অবহেলা।

স্কন্দমন্দিরেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কাশ্মীরপতি। সেই উপলক্ষে পক্ষব্যাপী নৃত্য-গীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে ঐ দেব-মন্দিরে—রাজা জয়ন্তের বিশেষ আদেশে। স্কন্দমন্দিরে পূজা-আরাধনার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। রাজকোষ থেকে এ জন্য বিশেষ অর্থের ব্যবস্থাও রাজা করে দিয়েছেন।

আজ স্কন্দমন্দিরে পূজা দিতে আসবেন রাজকুমারী কল্যাণদেবী। সর্বসাধারণের জন্য মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত থাকবে না, আজ সন্ধ্যায়। রাজ-অবরোধের অঙ্গনা এবং সখিদের নিয়ে রাজনন্দিনী আসবেন দেব-মন্দিরে। সন্ধ্যাবন্দনা করবেন। দেখবেন সন্ধ্যারতি।

পক্ষকালের উৎসব শেষে রাজনন্দিনীর বিবাহের শুভ দিন ধার্য হয়েছে।

'কাশ্মীরপতির সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজবালার বিবাহের দিন ধার্য হয়েছে।' অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে কমলা নিজের মনেই। 'কাশ্মীরপতির অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে—কিম্বা হতে চলেছে। ভালোই হোক!' দীর্ঘশ্বাস মোচন করে কমলা।

'দেবনটীর জীবন দেবতার জন্য উৎসর্গীকৃত। তার মনের কামনা-বাসনার কথা কে জানতে চায়? মূল্যই বা দেয় কে?'

দর্পণ হাতে তুলে নিয়ে—কপালে তিলক আঁকতে আঁকতে, ভাবে কমলা।

দেবনর্তকীর দীর্ঘ কালো কেশরাজি বিচিত্র ছাঁদে কবরীতে বদ্ধ করতে করতে মাধবীর চক্ষু সজল হয়ে উঠলো।

দেবী কমলা কত কৃশ হয়ে গেছেন এই কয়দিনেই!

বেশভূষায় তাঁর মনোযোগ নেই, মন নেই প্রসাধনে।

আগে নিয়মিতভাবে রূপচর্চা করতেন দেবনটী। এই কয়দিন সবই যেন ভুলে গেছেন তিনি। কেমন উদাসিনী হয়ে উঠেছেন!

দেবী কমলা হয়ে উঠেছেন যেন বিষাদ-প্রতিমা।

আহারেও রুচি নেই।

সর্বদা বিরলে বসে নিজের মনে কি যে চিন্তা করেন!

কেবল চিত্রপুত্তলিকার মতো প্রত্যহ উপস্থিত হন দেবমন্দির-প্রাঙ্গণে। মাধবী আর চতুরিকা যথাসম্ভব বেশভূষা সম্পাদন করে দেয়। নয়তো সাজ-সজ্জার প্রতি কোনই দৃষ্টি নেই আর কমলার।

মাধবী জাতিপুষ্পের মালাটি সযত্নে জড়িয়ে দিলো কমলার কবরীতে।

'দেবী, এবার অলঙ্কারগুলি পরুন।' মঞ্জরী বলে ওঠে।

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কমলা এগিয়ে দেয় তার মৃণাল বাহুদুটি।

—'কোন অলঙ্কারগুলি পরাবো? সুবর্ণ না মণিময় বলয়? হীরক না মরকত?'

কমলা উত্তর দেয় না। বসে থাকে তেমনি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে।

'মঞ্জরী। আজ দেবী কমলাকে সাজিয়ে দে রক্তমণির অলঙ্কারে। অগ্নিবর্ণ অলঙ্কৃত ক্ষৌম বস্ত্র রেখেছি পরিধানের জন্য। রত্নমণি আর সুবর্ণের অলঙ্কার ওই সাজের সঙ্গে মানাবে ভালো।' নির্দেশ দেয় মাধবী।

বেশভূষা সমাপ্ত হলে উঠে দাঁড়ায় কমলা।

তাকে দেখাচ্ছে দীপ্ত অগ্নিশিখার মতো।

সুগৌর চরণে চতুরিকা নিপুণ হাতে টেনে দিয়েছে অলক্তরেখা।

—'দেবী, শিবিকা প্রস্তুত। আর বিলম্ব করা উচিৎ হবে না।'

মাধবী ব্যস্ত হয়। 'রাজনন্দিনী স্বয়ং আসবেন দেবমন্দিরে সন্ধ্যার্চনা করতে। তাঁর জন্যই আজ সন্ধ্যার বিশেষ অনুষ্ঠান। দেব-মন্দিরে তিনি উপস্থিত হবার আগেই, আপনাকে উপস্থিত হবে যে!'

'হ্যাঁ, চলো।' নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

শিবিকায় আরোহণ করে দেবমন্দিরের উদ্দেশে যাবার পথে কমলা ভাবছিল কত কি কথা।

কাশ্মীরপতি কল্লাট নাম নিয়ে এ নগরীতে স্কন্দমন্দিরে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর ভাবী বধূ রাজনন্দিনী কল্যাণদেবী আসছেন স্কন্দমন্দিরে। বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে তাঁর সম্মানার্থে। রাজ-অন্তঃপুরিকারাও আসবেন রাজকন্যার সঙ্গে। রাজকন্যা ভাবী স্বামীর কল্যাণকামনায় পূজা দিতে আসছেন।

মাধবীও চলেছিল কমলার সঙ্গে।

মাধবী কমলার একান্ত অনুগতা, বিশেষ অনুরক্তা। তাই স্বামিনীর মনোবেদনার কারণ বুঝতে তার বাকি ছিল না।

মাত্র কয়েকদিনের আতিথ্য নিয়েই কাশ্মীরপতি দেবনর্তকীর হৃদয়-মন-প্রাণ অধিকার করে বসেছিলেন। কমলা তাঁর বিরহে এখন জগৎ সংসারও বিস্মৃত হয়ে বসেছেন।

হায়, দেবনর্ত্তকীর কি অভিশপ্ত জীবন!

মনের দুঃখে বক্ষ বিদীর্ণ হলেও, মুখে কিছু বলার উপায় নেই।

এই কৃষ্ণপক্ষ শেষ হলেই যে শুক্ল পক্ষ তার মধ্যে কাশ্মীরপতির সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজকন্যার বিবাহের দিন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

সামান্য এক দেবনটীকে কে আর মনে রাখে?

কিন্তু স্বামিনীর মনোকষ্টে মাধবীর বক্ষও বিদীর্ণ হচ্ছে। সেই বা কি করবে?

দেবনর্তকীর এক নিরুপায় পরিচারিকা।

স্কন্দমন্দির-প্রাঙ্গণ সেদিন বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল। চারদিকে পুষ্পমালা। পুষ্পস্তবক। ধূপ-ধূনার সুরভিত ধোঁয়া। পুষ্পমালার সুবাসে বাতাস যেন মন্থর। প্রাঙ্গণে সুবর্ণ ও রৌপ্য দীপাধারে প্রদীপ জ্বলছে।

রাজকন্যার সান্ধ্যার্চনার পর পুরোহিতেরা সন্ধ্যারতি করলেন।

এরপর দেবনটীদের নৃত্য গীত শুরু হলো।

সবার শেষে এলো কমলা। পরনে তার অগ্নিবর্ণের বসন।

আরাত্রিকা নৃত্যে…অপরূপ ভঙ্গিমায়—নিপুণ হস্তমুদ্রায় কমলা

যেন মূর্তিমতী অগ্নিশিখার মতোই দীপ্ত হয়ে উঠলো। পুরাঙ্গনারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার নৃত্য দেখছিলেন। তাঁরাও নৃত্যগীতনিপুণা।

কমলার পারদর্শিতায় তাঁরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিলেন বারংবার। প্রশংসা করছিলেন কমলার নৃত্যশিক্ষার।

নৃত্য শেষ হলো।

প্রথমে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানালো কমলা। তারপর এগিয়ে এসে অভিবাদন জানালো রাজকুমারী কল্যাণদেবীকে। রাজনন্দিনী স্মিত মুখে প্রশংসা করলেন দেবনটীর।

মনে ভাবলেন, এই সেই দেবনর্তকী, এ নগরীতে উপস্থিত হয়ে কাশ্মীরপতি যার গৃহে অতিথি হয়েছিলেন।

রমণীসুলভ ঈর্ষার বদলে রাজকন্যার অন্তঃকরণে দেবনটীর প্রতি প্রীতির ভাব। সজল কালো দুটি হরিণ নয়ন কমলার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির উপরে রেখে রাজকন্যা কল্যাণদেবী অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কোমল কণ্ঠে বললেন, 'দেবনর্তকী, তুমি যেমন অপরূপা, তেমনিই অশেষ গুণশালিনী!'

রাজকন্যার প্রশংসাবাক্যে কমলা সলজ্জ ভঙ্গিতে তার সুঠাম দেহ-বল্লরী নত করলো।

রাজনন্দিনীর রূপ দেবীপ্রতিমার মতোই। তেমনি তার অভিজাত আচরণ। এ রমণী কাশ্মীরনাথেরই উপযুক্ত। একে লাভ করলে, কাশ্মীরপতি কি আমার কথা কখনও স্মরণ করবেন? কি জানি! মনে মনে চিন্তা করলো কমলা। মুখে বললো, 'আপনার কথায় নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি, রাজনন্দিনী।'

মৃগলোচনা কল্যাণদেবী তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন দেবনর্তকীর মুখের উপরেই। অগ্নিবর্ণের বসনে, রক্তমণির অলঙ্কারে, কমলাকে দেখাচ্ছিল দীপ্তশিখার মতো।

কাশ্মীরপতি যে অভিজাত বংশীয় পুরুষদের মতো পদ্ম-পলাশ-লোচনা এই রমণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে এর প্রতি আকৃষ্ট হবেন, এর গৃহে

অবস্থান করতে আগ্রহান্বিত হবেন, তাতে আশ্চর্য কি? আমিই মুগ্ধ হয়ে পড়েছি কমলাকে দেখে। মনের মধ্যে এই ভাবনা রাজকন্যার।

অপলক নয়নে কমলাকে দেখতে দেখতে স্নিগ্ধ গলায় বলে উঠলেন, 'দেবনর্তকী, তোমার নৃত্যগীত-কুশলতা এ নগরীতে প্রায় প্রবাদ-তুল্য। আজ নিজের চোখে তোমার নৃত্য দেখে, নিজের কানে তোমার সঙ্গীত শ্রবণ করে, বড় তৃপ্ত হলাম। ধন্য তোমার শিক্ষা, সার্থক তোমার সাধনা!'

আবার যুক্তকরে রাজকন্যাকে অভিবাদন করলো কমলা। মন তার চঞ্চল। তার প্রেমাস্পদকে লাভ করলেন রাজকুমারী। কিন্তু রাজকুমারীর প্রশংসা কমলার মন ভরিয়ে দিয়ে গেলো।

॥ পঁচিশ ॥

পুণ্ড্রবর্ধন নগরী আজ আনন্দে উদ্বেল।

আজ পুণ্ড্রবর্ধনরাজের একমাত্র কন্যার বিবাহ।

প্রতি গৃহ-চূড়ায় উড়ছে বিচিত্র বর্ণের পতাকা।

পুরবাসীরা নিজ নিজ গৃহদ্বারে স্থাপন করেছে মঙ্গল কলস।

প্রবেশদ্বারের মাথায় সাজিয়েছে পুষ্পমালা আর আম্রপল্লব। মঙ্গল কলসের পাশে কদলীবৃক্ষও শোভা পাচ্ছে কোন কোন গৃহদ্বারে।

রাজার আদেশে মিষ্টান্ন, ফল এবং অন্যান্য আহার্য বিতরণ করা হচ্ছে নগরীর ঘরে ঘরে। পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর দীন-দরিদ্র অধিবাসীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য আর নব বস্ত্র দান করা হচ্ছে। তারা আহ্লাদিত হয়ে রাজা জয়ন্ত ও রাজজামাতা জয়াপীড়ের জয়ধ্বনি দিচ্ছে বারংবার।

রাজপথের দুই পাশে সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা-গুলিকেও বিশেষভাবে সজ্জিত আর অলঙ্কৃত করা হয়েছে।

রাজপথের দুই পাশের বিপণিগুলিও পুষ্পমালা, আম্রপল্লব আর শোলার অলঙ্কারে শোভিত।

প্রশস্ত রাজপথের মাঝে মাঝেই মঙ্গল-তোরণ নির্মিত হয়েছে। শিল্পীরা কাষ্ঠতোরণগুলি অভিনব কৌশলে সজ্জিত করেছে, কার্পাস বস্ত্রের তৈরি রঙীন ফুল আর শোলার কারুকার্য দিয়ে।

শৌণ্ডিকালয়ে পানোন্মত্ত নাগরিকদের আনাগোনার বিরাম নেই। কোন প্রমত্ত পুরবাসীকে ঘিরে জনতা কৌতুক করছে। কোন বৃদ্ধ নাগরিক তরুণ বয়সীদের ডেকে ডেকে শোনাচ্ছে, রাজা জয়ন্তের বিবাহে কেমন আড়ম্বর হয়েছিল।

বারবামাদের গৃহেও অনবরত গীতবাদ্যের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বিশিষ্ট অতিথিদের নৃত্যগীতে সন্তুষ্ট করার নির্দেশ রয়েছে তাদের উপরে।

সংবাদ পেয়ে বিবাহের পূর্বেই পুণ্ড্রবর্ধন নগরে উপস্থিত হয়েছেন সেনাপতি দেবশর্মা আর কাশ্মীররাজের অনুগত সেনাবাহিনী। তাদের সকলকে বরযাত্রী হিসেবে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন রাজা জয়ন্ত এবং সভাসদবর্গ।

উৎসবমুখর দিনটি শেষ হয়ে সন্ধ্যা হলো। সন্ধ্যায় পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর আর এক রূপ।

রাতের অন্ধকারে দীপমালায় সজ্জিত নগরী যেন অপরূপা হয়ে উঠলো। পথপার্শ্বে, সৌধশিখরে, অলিন্দে, বাতায়নে—সর্বত্র বিভিন্ন আকারের দীপাধারে দীপ জ্বলছে।

বিচিত্রভাবে রঙীন এবং উজ্জ্বল বেশভূষায় সজ্জিত নাগরিক এবং নাগরিকারা রাজপথে, গৃহদ্বারে হাস্যপরিহাসে রত। উৎসবমুখর সমগ্র নগরীই যেন আজ আনন্দে মগ্ন হয়ে আছে!

পুণ্ড্রবর্ধনের রাজপ্রাসাদও উৎসবসাজে সজ্জিত। চারধারে পুষ্পমালা, আম্রপল্লব, মঙ্গল কলস। প্রাসাদের চূড়ায় চূড়ায় রঙীন

পতাকা। স্তম্ভে, অলিন্দে পুষ্প-পল্লব। সহস্র সহস্র দীপমালায় রাজপুরী শোভিত, আলোকিত।

রাজ-অন্তঃপুরে মহামূল্য ও বিচিত্রবর্ণ বস্ত্র এবং বিবিধ অলঙ্কার ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত পুরনারীরা পরস্পরে রঙ্গ কৌতুকে মত্ত। বিবাহের মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সাজাতে সাজাতে তাদের রসিকতা প্রায়ই শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

পুণ্ড্রবর্ধনরাজ জয়ন্তের মহিষী—কন্যার পরম সৌভাগ্যে গরবিনী। কিন্তু কন্যা বিবাহের পরই দূর প্রবাসে পতিগৃহে চলে যাবেন, এই আসন্ন বিচ্ছেদবেদনার কথা স্মরণ করে, তাঁর চক্ষে জল আসছে। অশ্রুজলে কন্যার অমঙ্গল হতে পারে এই আশঙ্কা করে, রাজমহিষী বার বার নয়নের জল মুছে ফেলছেন, অলঙ্কৃত মহামূল্য ক্ষৌম বসনের প্রান্তে।

বিবাহ লগ্ন সমাগত প্রায়।

রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে পুষ্পমালায় সুবাসিত আর দীপালোকে উজ্জ্বল একটি কক্ষে রাজকন্যাকে বধূবেশে সজ্জিত করে দিচ্ছিল তাঁর সখীরা।

সখীরা কল্যাণদেবীর কপালে পরিয়ে দিলো মনঃশিলার তিলক, সুবর্ণ টিপ। মৃগনয়নী রাজকন্যার দুটি আয়ত চক্ষুতে কাজল রেখা টেনে দিলো। কোমল কঠিন বক্ষে এঁকে দিলো কর্পূর, কস্তুরী আর চন্দনের পত্রলেখা। সুবর্ণগৌর দুটি চরণপদ্মে অলক্তকের রেখা চিত্রিত করে পরিয়ে দেওয়া হলো সোনার নূপুর।

শিল্পকলায় বিশেষ অভিজ্ঞা এক পুরাঙ্গনা রাজনন্দিনীর মসৃণ ললাটের সোনার টিপ ঘিরে চন্দন দিয়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য চিত্রিত করে দিলেন। রাজকন্যার ওষ্ঠের স্বাভাবিক রক্তিমা গাঢ়তর করা হলো অলক্তকের স্পর্শে। তাঁর দীর্ঘ ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাজি কবরীবদ্ধ করে, সখীরা যূথীপুষ্পের মালা জড়িয়ে দিলো গন্ধতৈলসিক্ত কবরীতে।

এরপর চিত্রমতিকা নিয়ে এলো অলঙ্কারপূর্ণ পেটিকা। যত্ন করে অলঙ্কারগুলি তুলে নিলেন পুরাঙ্গনারা। রাজকন্যাকে অলঙ্কার পরাতে

লাগলেন একটি একটি করে। তারপরে সকলের দৃষ্টি রাজকন্যার পেলব মুখটির দিকে আকর্ষণ করে হাস্যমধুর কণ্ঠে চিত্রমতিকা বললো, 'কি অপরূপ দেখাচ্ছে আজ রাজকুমারীকে!'

রাজমহিষী এগিয়ে এসে নতমুখী কন্যার চিবুক স্পর্শ করলেন। তারপর তুলে ধরলেন কন্যার মুখখানি। জননী শুধু মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'সুখে থাকো।'

মাতা এবং কন্যা দুজনেরই চক্ষু সজল।

মহিষী বহুকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করলেন। মন তাঁর আনন্দ বেদনায় পূর্ণ। রাজচক্রবর্তী জামাতা স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের রাজ্যে। এমন বহুবাঞ্ছিত সুপাত্র তাঁর কন্যার বহু জন্মের শিব-আরাধনার ফল। চক্ষু মুদিত করে একবার ইষ্টদেবতাকে প্রণাম জানালেন রাণী মনে মনে।

আবার একবার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন কন্যার দিকে। সস্নেহে কন্যার শিরে চুম্বন করে—মহিষী পুরাঙ্গনাদের উদ্দেশে সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন, 'অবিলম্বে বেশভূষার পাট সমাধা করো তোমরা। বিবাহের শুভ লগ্ন সমাগত।'

সখীরা দ্রুত হাতে রাজকন্যাকে অলঙ্কার পরাতে লাগলো। কানে রত্নখচিত কর্ণাভরণ, গলায় সাত লহর মুক্তার মালা। মরকত, হীরা, রক্তমণির রত্নহার। হাতে শঙ্খবলয়, স্বর্ণবলয় এবং রত্নখচিত অন্যান্য অলঙ্কার।

রাজকন্যার সজ্জা সমাপন হলে, সখীরা এবং অন্যান্য পুরাঙ্গনারা রাজনন্দিনীকে বিবাহমণ্ডপে নিয়ে এলো।

এদিকে, বরবেশে সজ্জিত কাশ্মীরপতিকে নিয়ে দেবশর্মা এবং অন্যান্য বরযাত্রীরা শোভাযাত্রা সহকারে উপস্থিত হলেন রাজ-প্রাসাদে।

একটি সুবর্ণ ও মুক্তার সাজে সজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে সুবর্ণময় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন কাশ্মীরপতি। তাঁর মাথার উপরে চীনাংশুকের মুক্তা-

খচিত রাজছত্র। কাশ্মীরপতির পরিধানে পট্টবস্ত্র। গলায় প্রলম্বিত মহার্ঘ মুক্তাহার। সুগৌর ললাটে শ্বেতচন্দনের তিলক। মাথায় উষ্ণীষ।

অন্যান্য বরযাত্রীরা সজ্জিত রথ বা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন ছিলেন। শোভাযাত্রার সঙ্গে পদব্রজেও এসেছেন কেউ বা। তাঁদের সকলের পরনে উজ্জ্বল রঙীন সাজ। মাথায় উষ্ণীষ।

প্রশস্ত রাজপথের দুপাশে উৎসুক নরনারী বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা নিরীক্ষণ করছিল। তাদের হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হলো পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর আকাশ-বাতাস।

রাজপ্রাসাদে বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা উপস্থিত হওয়ামাত্র বিবিধ বাদ্যে মাঙ্গলিক ধ্বনি উত্থিত হলো।

বরকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করে প্রাসাদে নিয়ে এলেন রাজা জয়ন্ত।

পুরাঙ্গনারা শঙ্খধ্বনি করলেন, লাজ ও পুষ্প বর্ষণ করলেন। মঙ্গল কলস ও কদলীবৃক্ষে শোভিত, শোলার কারুকার্যে সজ্জিত এবং আলিম্পনে চিত্রিত বিবাহ মণ্ডপে বরকে উপস্থিত করা হলো। এইসব শিল্পকলা এবং সজ্জানৈপুণ্য ও বর্ণ-বৈচিত্র্য কাশ্মীরবাসীদের চোখে অতি অভিনব মনে হচ্ছিল। গৌড়দেশের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের আন্তরিকতায় তারা মুগ্ধ হলো।

বরবধূকে বিবাহ সভায় উপস্থিত করার পর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শুরু হলো। স্বামী সোহাগিনী পুত্রবতীরা সযত্নে নানা ধরণের অনুষ্ঠানে রত হলেন। বেদ এবং স্মৃতি শাস্ত্র অনুসারী নানাবিধ কার্যে ব্যাপৃত হলেন ব্রাহ্মণেরা। রাজপরিবারের পুরুষেরা তাঁদের সহায়তা করতে লাগলেন। যজ্ঞবেদী ঘিরে ব্রাহ্মণেরা সমবেত কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ শুরু করলেন।

শঙ্খধ্বনি, মাঙ্গলিক বাদ্য আর শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে রাজা

জয়ন্ত হর্ষোৎফুল্ল মনে সালঙ্কারা পরম রূপবতী কন্যাকে সম্প্রদান করলেন কাশ্মীরপতির হাতে।

বধূসাজে অপরূপা কল্যাণদেবী মৃগনয়নের চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন রাজচক্রবর্তী স্বামীর দিকে।

রাজকন্যা দেখলেন—আয়তনেত্র, প্রশস্তবক্ষ, চম্পকগৌরবর্ণ দীর্ঘদেহী পুরুষের দৃষ্টি তাঁরই মুখের পরে নিবদ্ধ। হর্ষে, লজ্জায় শিহরিত হয়ে চক্ষু নত করলেন মৃগলোচনা রাজপুত্রী।

বিবাহের পর—বিবাহমণ্ডপ ছেড়ে বরবধূ চলে গেলেন রাজ-অন্তঃপুরে।

॥ ছাব্বিশ ॥

রাজপরিবারের পুরুষেরা এবং রাজকর্মচারীরা অতিথিদের অভ্যর্থনায় তৎপর হলেন। একদল বিশেষভাবে নিযুক্ত রইলেন বরযাত্রীদের আপ্যায়নের কাজে।

পুণ্ড্রবর্ধনে উপস্থিত হয়ে সেনাপতি দেবশর্মা আর কাশ্মীরী সেনাদের দিনগুলি বেশ ভালোই কাটছিল।

কর্মদক্ষ দাস এবং সুচতুরা সুন্দরী দাসীরা তাদের সেবায় ও পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল। অপর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয়ে কাশ্মীরী সেনারা দেহে ও মনে পরম পরিতুষ্ট ছিল। এর উপরে রসিকা মোহিনী বারাঙ্গনারা তাদের নিভৃত সঙ্গদানে তৃপ্ত করতো।

বিবাহের রাতে রাজ-অন্তঃপুরে বরযাত্রীদের নিমন্ত্রণ ছিল।

সে রাতে পুরাঙ্গনারা তাদের খাদ্য পানীয় পরিবেশন করছিলেন।

মাঝেমাঝেই প্রগলভ রঙ্গ কৌতুকের উত্তর প্রত্যুত্তরে কন্যা-পক্ষীয়দের এবং বরযাত্রীদের কর্ণমূল রাঙা হয়ে উঠছিল।

ভোজনের অবসরে তরুণ বরযাত্রীরা বঙ্কিম কটাক্ষে লক্ষ্য করছিল পুরাঙ্গনাদের। পুরাঙ্গনাদের হাতে সুবর্ণবলয়, কানে কুণ্ডল, গলায়

সুবর্ণ ও মুক্তার হার—পরনে পট্টাম্বর। মাথার চুল কবরীবদ্ধ, কারো চুলের বেণীর শেষাংশ শিখার মতো মুক্ত। চুলে জড়ানো ফুলের মালা। পুণ্ড্রবর্ধনের শ্যামলাঙ্গী তরুণীদের নয়ননন্দন সজ্জায় বরপক্ষীয়েরা মুগ্ধ।

কিন্তু মাঝে মাঝেই পুরনারীরা বরযাত্রীদের উৎকট কোন খাদ্য কি পানীয় পরিবেশন করে তাদের রহস্যের ছলে প্রতারণা করতে সচেষ্ট হয়ে উঠছিল।

আলিম্পনের জন্য রাখা চালের গোলামিশ্রিত জলকে দুগ্ধ বলে, অন্নের ভিতর মৃৎভাণ্ড রেখে—নানা উপায়ে, তারা অপ্রস্তুত বরযাত্রীদের বিব্রত করে তুলছিল। অবশেষে প্রবীণা পুরাঙ্গনারা—নবীনাদের ভ্রূকুটি ভঙ্গে শাসন করতে এগিয়ে এলেন। তাঁদের হস্তক্ষেপের ফলে যথাযথ আহার্য ও পানীয় পরিবেশিত হতে লাগলো।

সবুজবর্ণ পাত্রে বরযাত্রীদের অন্ন এবং ব্যঞ্জন পরিবেশন করা হলো।

বরযাত্রীরা ঈষৎ মনোক্ষুণ্ণ হলেন। রাজকন্যার বিবাহের ভোজে শাকান্ন পরিবেশিত হচ্ছে?

তাদের দ্বিধা দেখে প্রবীণা অন্তঃপুরিকারা সহাস্যে বললেন, 'এ শাকান্ন নয়। সবুজ বর্ণের পাত্র, তাই অন্নকে সবুজ বলে মনে হচ্ছে।'

সেনাপতি দেবশর্মা শাকান্ন ভেবে আহারে বিরত হয়েছিলেন। এখন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে আহারে প্রবৃত্ত হলেন।

পরিবেশনকারিণীরা বরযাত্রীদের সামনে অসংখ্য ব্যঞ্জন, রোহিত প্রভৃতি মৎস্য এবং হরিণ, ছাগ ও পক্ষী মাংসের বিভিন্ন পদ উপস্থিত করলেন। দধি আর সরিষাযুক্ত শ্বেতবর্ণের একটি ব্যঞ্জন খেয়ে বর-যাত্রীরা মাথা নাড়তে লাগলেন এবং বারবার তালুতে আঘাত করলেন। বড়ই ঝাল ব্যঞ্জন, লঙ্কার অত্যুগ্র স্বাদযুক্ত!

ব্যঞ্জনের শেষে নানা ধরণের সুমিষ্ট পিষ্টক, পরমান্ন এবং সুশীতল দধি খেয়ে তৃপ্ত হলো বরযাত্রীরা। গৌড়দেশের রাজসিক আহার্যের বাহুল্যে কাশ্মীরবাসীরা অভিভূত বোধ করলেন।

সুবর্ণভৃঙ্গারে কর্পূরমিশ্রিত সুগন্ধি জলে বরযাত্রীদের তৃষ্ণা নিবারণ

করলেন পুরস্ত্রীরা। এরপর পান ভোজনে তৃপ্ত বরযাত্রীদের হাতে তরুণী পুরাঙ্গনারা স্মিত হাস্যে তুলে দিলেন কর্পূর ও সুগন্ধি মশলাযুক্ত স্বর্ণ আর রৌপ্যপাত্র ভরা তাম্বুলের খিলি।

এরপর হৃষ্ট এবং পরিতুষ্ট বরযাত্রীরা অতিথিভবনে রাত্রি যাপন করতে চললেন। সদা তৎপর দাসদাসীরা দীপ হাতে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

বীণা ও বাঁশির সুরে মুখরিত প্রাঙ্গণ দিয়ে স্বপ্নোত্থিতের মতো এগিয়ে চললেন দেবশর্মা, তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে।

ইন্দ্রপুরীতুল্য রাজপ্রাসাদের সুসজ্জিত অতিথিভবনেও সে রাত্রে নৃত্যগীতকুশলা নটনটীরা অতিথিদের মনোরঞ্জন করবার জন্য অপেক্ষা করছিল।

নানাবিধ গৌড়ীয় মাধ্বী সহযোগে দাসদাসীরা অতিথি পরিচর্যায় তৎপর হলো।

গীতবাদ্য আর নৃত্য উপভোগ করতে করতেই সে রাতটি কেটে গেলো কাশ্মীরী সেনাদের।

এখানকার ধন, সম্পদ, শিল্প, সংস্কৃতি সম্বন্ধে পুণ্ড্রবর্ধনে এসে তাদের অনেক অভিজ্ঞতা হলো। আরো অনেক মধুর অভিজ্ঞতা হলো এখানকার রাজকন্যার বিবাহরজনীতে!

॥ সাতাশ ॥

রাজ-অন্তঃপুরের কৌতুকগৃহে বা বাসরকক্ষে, বধূ রাজকন্যা কল্যাণদেবী এবং বর বিনয়াদিত্য জয়াপীড়কে ঘিরে তরুণী অন্তঃপুরিকারা হাসি কৌতুকে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন।

বিনয়াদিত্যের বামপাশে কল্যাণদেবীকে বসিয়ে এক যুবতী বলে উঠলেন, 'দেখ, দেখ, শ্রীরামচন্দ্রের পাশে সীতাদেবীর মতো দেখাচ্ছে রাজনন্দিনীকে!'

'রামচন্দ্র তো দুর্বাদল শ্যাম। কাশ্মীরপতির কান্তি তো সুবর্ণগৌর, হেসে বলে উঠলেন এক রূপসী।

'তা হ'লে এরা যেন রাধাকৃষ্ণ!' আর এক তরুণী মন্তব্য করলেন।

তরুণীর মন্তব্যে কৌতুকগৃহে হাসির তরঙ্গ উঠলো।

অপর এক সুরসিকা ভ্রূভঙ্গি করে কৃত্রিম বিস্ময়ে অনুযোগ করলেন, 'সখি, তোমারও দৃষ্টি বিভ্রম ঘটছে। রাজকন্যার বর কাশ্মীরনাথের রূপ কি তোমারও নয়ন অন্ধ করে দিয়েছে? তুমি বলতে চাও এই বরের বর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মতোই শ্যামবর্ণ, তাই না?'

আবার তরুণী পুরস্ত্রীদের কলহাসিতে উদ্বেল হয়ে উঠলো রাতের উতলা বাতাস।

হাসি থামলে এক পুরাঙ্গনা কাব্যময় কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'না, না। তোমরা ভুল করছো। কাশ্মীরপতি আর আমাদের রাজনন্দিনীর মিলন যেন শঙ্কর-পার্বতীর মিলন। দেবাদিদেব শঙ্কর হলেন রজত-গিরি নিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।'

পুরাঙ্গনার এই কথা কানে যেতে লজ্জায় অবনতমুখী হরিণনয়না কল্যাণদেবী চকিতে একবার মুখ তুলে তাকালেন স্বামীর দিকে। দেখলেন, তিনি রজত-গৌরবর্ণ, শুভ্র পট্টবস্ত্র, শ্বেত-চন্দনের তিলক আর মুক্তার মালায় শোভিত, অপরূপ দিব্যকান্তি। সত্যই তাঁর স্বামী 'রজতগিরিনিভং'।

মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করলেন রাজনন্দিনী। মুদিত নয়নে, সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম জানালেন তাঁকে।

রাজমহিষী একবার বাসর কক্ষে এসে দেখে গেলেন বরকন্যাকে। রাজমহিষী ব্যক্তিত্বময়ী, স্নিগ্ধ গাম্ভীর্যে মাতৃরূপের প্রতিমূর্তি। রাজ-জামাতা বিনয়াদিত্য জয়াপীড়কে আশীর্বাদ করলেন মহিষী। জামাতার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে স্বীকার করলেন, প্রাণের পুত্তলি কন্যাকে যোগ্য পাত্রেই সমর্পণ করেছেন রাজা জয়ন্ত!

এবার প্রবীণা পুরস্ত্রীরা নবীনা অন্তঃপুরিকাদের তাড়না করতে

লাগলেন, 'যাও, যাও। তোমরা এবার কৌতুকগৃহ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাও। এ কক্ষে এখন বরবধূ বাসররাত্রি যাপন করবেন। বরবধূকে আর তোমরা উত্যক্ত করবে না। রাত্রি অনেক হলো।'

প্রবীণাদের তাড়নায় আর শাসনে তরুণী অন্তঃপুরিকারা নূপুরের নিক্কন এবং অলঙ্কারের ঝঙ্কার তুলে অনিচ্ছুক পায়ে কৌতুকগৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

চিত্রমতিকা চুপিচুপি রাজকন্যা কল্যাণদেবীর কাছে এসে তাঁর কানে কানে বলে গেলো, 'সখি, আর্যপুত্রকে একাকী পেয়ে জগৎ সংসারকে বিস্মৃত হয়ো না যেন। আজ রাতে অন্তঃপুরিকারা তোমাদের এই কৌতুকগৃহের চারপাশেই থাকবে কিন্তু।'

সখির কথা শুনে লজ্জায় কল্যাণদেবীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠলো।

আর চিত্রমতিকার কথা কর্ণগোচর হতে, স্মিত হাসির রেখা ফুটলো বিনয়াদিত্যের মুখে।

কৌতুকগৃহের দ্বার বন্ধ করে দিয়ে বাইরে চলে গেলো চিত্রমতিকা।

বাসরকক্ষে এখন কেবল বর আর বধূ।

পুষ্পমালা আর পুষ্পস্তবকে শোভিত কক্ষ।

কক্ষের কোনে এবং শয্যাপার্শ্বে স্বুবর্ণ দীপাধারে জ্বলছে স্বুগন্ধি দীপ।

কৌতুকগৃহের বাতাস স্বুগন্ধে স্বুরভিত হয়ে যেন মন্থর হয়ে গেছে। স্বুবর্ণ পালঙ্কে সোনা, রূপা এবং মুক্তায় অলঙ্কৃত কোমল চীনাংশুকের শয্যা।

কক্ষ শূন্য হলে, বিনয়াদিত্য পালঙ্ক ছেড়ে উঠে, দাঁড়ালেন এসে অবনতমুখী নবপরিণীতা বধূর সামনে। ধীরে ধীরে রাজকন্যার মুখখানি তুলে ধরলেন। স্বুবর্ণপ্রতিমার মতো অনিন্দ্যস্বুন্দর রূপ। দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন।

রাজকন্যার আয়ত চক্ষুদুটি মুদিত। বান্ধুলি পুষ্পের মতো ওষ্ঠাধর কম্পিত হচ্ছিল।

স্বামীর স্পর্শে চোখ দুটি ধীরে ধীরে খুললেন রাজকন্যা। যেন রবিকরস্পর্শে মুদিত কমলদল প্রস্ফুটিত হলো।

বিনয়াদিত্য গভীর অনুরাগে চুম্বন অঙ্কিত করলেন কল্যাণদেবীর কম্পিত ওষ্ঠে। প্রথম প্রণয়স্পর্শে শিহরিত হলো রাজনন্দিনীর দেহ-বল্লরী। তারপর শয্যায় বসে জয়াপীড় রাজবধূকে বসালেন তাঁর পাশে।

রাজকন্যার একখানি মৃণাল বাহু তুলে নিলেন নিজের হাতে।

'রাজনন্দিনী', প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন কাশ্মীরপতি, 'ভাগ্য-বিড়ম্বিত হয়ে দূর বিদেশে এসে আমার পরিত্যক্তা রাজলক্ষ্মীকে আজ ফিরে পেয়েছি, মনে হচ্ছে। আজ আমি নিজেকে মহা ভাগ্যবান বলে মনে করছি।'

'আর্যপুত্র'! অস্ফুট কোমল কণ্ঠে বললেন কল্যাণদেবী। 'আর্যপুত্র, আমি আপনাকে স্বামীরূপে পেয়েছি। আমিও মহা সৌভাগ্যবতী। আমি যেন চিরদিন আপনার কল্যাণ কামনায় আপনার সুখে দুঃখে আপনার পাশে ছায়ার মতো থাকতে পারি। ইষ্টদেবতার কাছে এই প্রার্থনাই জানাচ্ছি।'

নব বধূর মধুর ও স্নিগ্ধ ভাষণে অভিভূত এবং চমৎকৃত হলেন, বিনয়াদিত্য জয়াপীড়।

আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন কল্যাণদেবীর কম্পিত বরতনু, তাঁকে আকর্ষণ করলেন বিস্তৃত বক্ষপুটে। এই কক্ষের বাহিরে অন্তঃপুরিকাদের উপস্থিতির কথা মনে করে রাজকন্যা স্বামীর দেহস্পর্শের এই পরম মুহূর্তে নির্বাক আনন্দে বিভোর হলেন।

বাসর কক্ষের—সুবর্ণ দীপের স্নিগ্ধ আলোয় নবপরিণীতা বধূর আবেশ মুদিত নয়ন ও রাগরঞ্জিত মুখখানি নিরীক্ষণ করতে করতে—বিদ্যুৎ চমকের মতো কাশ্মীরপতির মানসচক্ষে ভেসে উঠলো পরম রূপবতী আর এক রমণীর অশ্রুপ্লাবিত মুখটি। বিদায়ক্ষণে সে রমণী বলেছিল তাঁকে—স্মৃতি সম্বল করে বেঁচে থাকবে সে।

কাশ্মীরপতি তাকে কি বলেছিলেন?

নববধূকে পাশে নিয়ে জীবনের এমন মধুর লগ্নেও ক্ষণিকের জন্য উন্মনা হলেন কাশ্মীরপতি।

॥ আটাশ ॥

সেই রাতে নিজের গৃহের শিখর থেকে নির্নিমেষ নয়নে দীপালোক-সজ্জিত রাজপ্রাসাদের দিকে তাকিয়েছিল, দেবনর্তকী কমলা।

আজও দেবমন্দিরে নৃত্য করতে হয়েছিল তাকে। দেবনটীর কি অভিশপ্ত জীবন!

রাজকন্যার বিবাহ উপলক্ষে আজ সন্ধ্যাতে মন্দিরে মন্দিরে বিশেষ পূজা আর আরাত্রিকার আয়োজন ছিল। আর স্কন্দমন্দিরে ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল রাজার আজ্ঞায়।

পুণ্ড্রবর্ধনের নটীমুখ্যা কমলা। তাই, তাকে দেবমন্দিরে বিশেষ পর্বদিন বা শুভদিন উপলক্ষে নিয়মিত দীর্ঘ সময়ব্যাপী নিজের নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হয়। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

মাধবী আজ তাকে সাজিয়েছিল রক্তাম্বরে। একটি একটি করে পরিয়েছিল স্বর্ণ আর রত্নালঙ্কারগুলি। বিচিত্র ছাঁদে কবরী বেঁধে দিয়েছিল—গন্ধ তৈলে সিক্ত করে। তারপর তাতে জড়িয়ে দিয়েছিল সুগন্ধি শুভ্রকুসুমের মালা।

দেবমন্দিরে নাচতে নাচতে আজ সন্ধ্যায় বার বার আত্মবিস্মৃত হচ্ছিল কমলা।

ময়ুরপৃষ্ঠে মহারাজলীলা ভঙ্গিতে উপবিষ্ট কার্তিকেয় মূর্তির সামনে যতোবারই নিবেদনের ভঙ্গিতে প্রণাম জানাচ্ছিল নৃত্যের মধ্যে, ততোবারই দেবমূর্তি যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তার চোখের সামনে থেকে। তার অতি প্রিয়, অতি সুদর্শন সেই তরুণ অতিথির মুখ বার বার ভেসে উঠছিল তার মানসচক্ষে।

ভয়ে, সঙ্কোচে শিউরে উঠছিল দেবনর্তকী।

'ক্ষমা করো দেবতা! সামান্য মানবী আমি।' অস্ফুট স্বরে আপন মনে বলে চলে, 'তোমার মূর্তিকে যে দেহধারী সর্বক্ষণ আড়াল করে রাখছে, তার কোন অপরাধ নিও না। সব অপরাধ আমার। আমি তাকে ভালোবেসেছি। মন, প্রাণ তারই পায়ে সমর্পণ করে বসে আছি।'

সে জানে কি আমার মনের কথা? দেবনর্তকী নিজেকেই প্রশ্ন করে।

কিন্তু আমি যে এক মুহূর্তের জন্যও তাকে বিস্মৃত হতে পারি নি। পারবোও না। হায় অদৃষ্ট! কি বিড়ম্বনা!

দেবতার অভিশাপের ভয়ে উৎচকিত কমলা ক্ষমাপ্রার্থিনী হয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহস্থ দেবমূর্তির দিকে তাকায়, যুক্তকরে, নৃত্যভঙ্গিমায়।

আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বরবেশী প্রিয়দর্শন তরুণ অতিথির স্মিত মুখখানি। পর মুহূর্তেই নির্বাক কণ্ঠে সেই অন্তর্যামীর উদ্দেশে আর্তি জানায়।

—'আমায় ক্ষমা করো দেবতা, ক্ষমা করো।'

এ কি আত্মবিস্মৃতি, এ কি বিহ্বলতা!

দেবনর্তকীর এই ভাবাবেগ কি শোভা পায়!

নাচের তাল ভঙ্গ হতে চলেছিল প্রায়।

বিস্মিত বাদকের দল বার বার আশ্চর্য হয়ে দেখছিল প্রধানা দেবনটী কমলাকে। তরুণ বীণাবাদক অনুষ্ঠানের শেষে প্রশ্ন করেছিল, 'দেবী, আপনি কি আজ অসুস্থ?'

কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়েছিল কমলা।

আজ রাজনন্দিনীর বিবাহের দিন।

পুণ্ড্রবর্ধন নগরের আপামর জনসাধারণ আনন্দসাসরে মগ্ন। কেবল আনন্দের লেশমাত্র বোধ নেই দুটি রমণীর মনে।

কমলা আর মাধবী।

গৃহে ফিরে—নিজেকে আর সংযত রাখতে পারে নি কমলা। দ্রুত

পায়ে নিজের শয়ন কক্ষে এসে কঠিন ভূমিতলেই আছড়ে পড়েছিল সে। আকুল ক্রন্দনে ফেটে পড়েছিল তার অবদমিত মর্মবেদনা।

দূরে কোথায় রাজপথে বাজছে বাঁশি। বাজছে মঙ্গল বাদ্য।

দীপহীন শূন্য কক্ষে একাকিনী কমলা ভূমিশয্যায়।

দ্বারপ্রান্তে কাষ্ঠপুত্তলির মতো দাঁড়িয়ে রইলো মাধবী, নিষ্পলক চোখে কমলার দিকে তাকিয়ে। তারও নয়ন অশ্রুপ্লাবিত।

সেও তো নারী!

মূল্যবান রত্নালঙ্কার দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় কমলা। টেনে খুলে ফেলে সুবিন্যস্ত কবরী। চোখের জলে নয়নের কাজল ধুয়ে গেছে। কমলা ছিন্ন করে ফেলে—কবরীর যূথীমালিকা।

শয়নকক্ষের ভূমিতল ছিন্ন ফুলে আকীর্ণ হয়। তারই মাঝে দলিত-মথিত কুসুমমালিকার মতো পড়ে থাকে কমলার দেহ।

—'দেবনটী বলে কি আমি রক্ত-মাংসের মানবী নই? আমার জীবনে প্রেম ভালোবাসা কি নিষিদ্ধ?' নিজের মনেই নিজেকে প্রশ্ন করে অভিমানিনী।

চিন্তা করতে করতে যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে ওঠে কমলা।

'মাধবী, মাধবী—কোথায় তুই? আমাকে এনে দে মাধবী, এনে দে মৈরেয়। আমি আর সহ্য করতে পারছি না, এই নিঃসঙ্গ অভিশপ্ত জীবনের যন্ত্রণা!' আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে সে।

মাধবী দিশাহারা হয়ে পড়ে। আজ কমলার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় দ্বারপাল আর মাধবী ছাড়া অন্য দাসদাসীরা কেউই নেই। রাজকন্যার বিবাহ উপলক্ষে, গৃহস্বামিনীর কাছ থেকে কর্মবিরতির অবসর নিয়ে তারা গেছে গৃহের বাইরে। উৎসব কৌতুকে যোগ দিতে।

—'দে মাধবী, মৈরেয়, নিয়ে আয় মাধবী।' হাহাকার করে ওঠে কমলা।

মাধবী বিমূঢ়। একাকিনী কমলাকে নিয়ে কি করবে সে। আকুল

কণ্ঠে সান্ত্বনা দেয় সে কমলাকে। 'দেবী, আপনি শান্ত হোন। কেন এমন আচরণ করছেন! এমন উতলা হওয়া কি দেবীর শোভা পায়?'

মাধবীর কথায় যেন সম্বিৎ ফিরে পায় ধৈর্যহারা কমলা। ক্ষণকালের জন্য যেন স্থির হয় সে।

দীপহীন কক্ষের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার। কিন্তু মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল কমলার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি। কমলা আবার ভূমিশয্যা নিলো।

রাত আরো গভীর হলো।

রাজপথের আনন্দ কোলাহলও ক্রমে নীরব হয়ে এলো। থেমে গেলো বাঁশির ধ্বনি, বাদ্যরব।

ধীরে ধীরে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কমলা। স্খলিত বস্ত্রাঞ্চল লুটোতে লাগলো মাটিতে। সন্ধ্যার মহার্ঘ রক্তাম্বর অবিন্যস্ত, দলিত। কবরীমুক্ত কেশরাজি ছড়িয়ে পড়লো কমলার বুকে, পিঠে।

শয়নকক্ষ পার হলো অতি সন্তর্পণে। দ্বারপ্রান্তে ভূমিশয্যায় ঘুমিয়ে আছে মাধবী, তার পরম অনুগত পরিচারিকা, পরম বিশ্বস্ত সঙ্গিনী।

মাধবীর নিদ্রাভঙ্গ করলো না কমলা। একাকিনী উঠে এলো প্রাসাদের শিখরে।

নির্জন রাত, নির্জন প্রাসাদশিখর।

রাজকন্যার বিবাহের উৎসব উপলক্ষে, কমলার সৌধচূড়াও আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছিল।

নির্জন রাতে উন্মুক্ত প্রাসাদশীর্ষের বেশীর ভাগ দীপই নিভেছে এখন। মত্ত বাতাসে কমলার বসনপ্রান্ত উড়তে লাগলো। অবিন্যস্ত আলুলায়িত কুন্তল গ্রীষ্মের বাতাসে আরো অবিন্যস্ত হয়ে উঠলো!

রাতের সুশীতল বাতাসে তৃপ্ত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে উৎসবমত্ত পুরবাসী। কিন্তু এমন মলয় বাতাসেও কমলার তাপিত চিত্ত শীতল হলো না।

কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক পদচারণা করলো দেব-

নর্তকী। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো সৌধশিখরের এক প্রান্তে। সেদিক থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দীপমালায় সজ্জিত পুণ্ড্রবর্ধনের রাজপ্রাসাদ।

আবার তার চক্ষুদুটি সজল হয়ে এলো। বক্ষের মধ্যে জেগে উঠলো কি কঠিন বেদনা!

আলোকমালায় শোভিত রাজপুরীর দিকে কতকটা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই তাকিয়ে রইলো কমলা। হঠাৎ তার মনে হলো—কাশ্মীরপতি এখন কৌতুকগৃহে কি করছেন!

॥ ঊনত্রিংশ ॥

রাজকন্যার বিবাহ হয়ে গেলো। বিবাহের উৎসবও শেষ হলো।

পুণ্ড্রবর্ধনরাজ জয়ন্ত জামাতাকে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য সচেষ্ট হলেন তিনি।

রাজসভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন রাজা জয়ন্ত। প্রয়োজনীয় পরামর্শ করলেন মন্ত্রী, সেনাপতি এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গের সঙ্গে।

তাঁরাও রাজার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

অতঃপর পুণ্ড্রবর্ধনরাজ—তাঁর রাজ্যভ্রষ্ট জামাতার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দিলেন। রাজ্যের সেনাপতির তৎপরতায়, তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে পূর্ণোদ্যমে সৈন্য সংগ্রহের কাজ শুরু হলো। কাশ্মীরসেনাপতি দেবশর্মাও তাঁর বাহিনী নিয়ে পুণ্ড্রবর্ধনেই অবস্থান করছিলেন।

কাশ্মীরপতি জয়াপীড় রাজা জয়ন্তের উদারতা এবং মহানুভবতায় মুগ্ধ হলেন। রাজ্যচ্যুত আশ্রয়হারা নৃপতি তিনি—দূর দেশের সামন্ত-রাজার কাছে যে আতিথ্য আর অভ্যর্থনা পেলেন, তার তুলনা নেই। কাশ্মীরপতির মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো।

পুণ্ড্রবর্ধনরাজ জয়ন্তের উদারতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোর করতে বদ্ধপরিকর হলেন জয়াপীড়।

পুণ্ড্রবর্ধনরাজের কন্যার সঙ্গে কাশ্মীরপতির বিবাহ উপলক্ষে গৌড়ের অন্যান্য রাজারাও অতিথি রূপে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন পুণ্ড বর্ধনের রাজধানী নগরীতে। তাঁরা তখনও পুণ্ড্রবর্ধনেই উপস্থিত ছিলেন। যাঁরা বিবাহ উৎসবে উপস্থিত হ'তে পারেন নি, তাঁদের সকলের কাছে দূত পাঠালেন, কাশ্মীররাজ বিনয়াদিত্য জয়াপীড।

গৌড়বিজয়ী ললিতাদিত্যের পৌত্র এবং কাশ্মীরের সিংহাসনের প্রকৃত অধীশ্বররূপে তিনি আদেশ দিলেন যে তাঁরা যেন পুণ্ড্রবর্ধন-রাজ জয়ন্তকে নিজেদের প্রধান রূপে গ্রহণ করেন। এই ভাবে জয়াপীড় বিনা যুদ্ধেই গৌড়ের পঞ্চ নরপতিকে জয় করে, রাজা জয়ন্তকে তাঁদের অধিপতি করে দিলেন!

এবার ভাগ্য পরীক্ষার পালা।

এদিকে রাজা জয়ন্ত—মন্ত্রী, সেনাপতি এবং অন্যান্য সভাসদদের সঙ্গে আবার পরামর্শ করলেন। গৌড় থেকে কাশ্মীরের উদ্দেশে যাত্রা করার উপযুক্ত সময় কখন, এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করলেন মন্ত্রণাগৃহে।

মন্ত্রী, সেনাপতি এবং সভাসদেরা এক বাক্যে বললেন, গ্রীষ্মকাল শেষ হয়েছে, বর্ষা সমাগত প্রায়। এ সময় স্থানান্তরে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। বর্ষার শেষে শরৎকালে কাশ্মীরপতি সসৈন্যে স্বদেশে যাত্রা করবেন। কারণ পূর্বে শরৎকালেই রাজারা দিগ্বিজয়ে বেরোতেন। এই সিদ্ধান্তে সকলেই হৃষ্ট হলেন।

কন্যা জামাতা আরো কিছুকাল পুণ্ড্রবর্ধনে অবস্থান করবেন শুনে, পরম পুলকিত হলেন রাজা জয়ন্তের মহিষী। কন্যাকে এমন অতিবাঞ্ছিত সুপাত্রের হাতে সম্প্রদান করা হয়েছে, এ তাঁর পূর্বজন্ম-কৃত পুণ্যের ফল। কিন্তু একমাত্র কন্যাকে কত দূর প্রবাসে স্বামীগৃহে

চলে যেতে হবে, এ চিন্তা মনে জাগরিত হলেই রাজমহিষীর চক্ষু সজল হয়ে আসে।

রাজকন্যাদের জীবন এমনই হয়, ভাবলেন রাণী। তিনিও তো রাজকন্যা, রাজমহিষী। বিবাহের পর পিতৃগৃহে কতবার গেছেন?

রাজকন্যার সখিদের মন বিষাদগ্রস্ত। প্রিয় সখি চিত্রমতিকাও আসন্ন বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করে, বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মোছে বারবার।

এমন রাজচক্রবর্তী স্বামীকে পেয়ে রাজনন্দিনী কল্যাণদেবীর আনন্দ ও গর্বের সীমা নেই। তবে তিনি প্রিয়ভাষিণী, উন্নতহৃদয়া। আনন্দ বা গর্ব, তাঁর কথা কি আচরণে প্রকাশ পায় না। কাশ্মীররাজের অর্ধাঙ্গিনী হয়ে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করেন তিনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবাল্য পরিচিত প্রিয়জন-পরিবেষ্টিত এই রাজপুরী, এই রাজ্য ছেড়ে দূরে উত্তরে স্বামীগৃহে যাবার কথা চিন্তা করে, মনে মনে তিনিও উতলা হয়ে পড়েন।

কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড়ও অতি ব্যস্ত। শত দিকে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হচ্ছে—পরামর্শ করতে হচ্ছে। শ্বশুর পুণ্ড্রবর্ধনরাজকে পঞ্চগৌড় নরপতির প্রধান করে দিয়ে—তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। মহৎহৃদয় পুণ্ড্রবর্ধনরাজ নিঃসন্দেহে এই সম্মানের যোগ্য।

কিন্তু শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কমলার কথা বিস্মৃত হন নি জয়াপীড়। দেবনর্তকীর মধুর মুখখানি সর্বদাই তাঁর মনে পড়ে।

দেবনটী তাঁর আশ্রয়দাত্রী। মূর্তিময়ী করুণা।

দেবনটী বিনিময়ে পার্থিব কোন ধনই আশা করে নি তাঁর কাছে। সে চেয়েছিল অপরিচিত বিদেশী অতিথির ভালোবাসা।

কমলা তো জানতো না যে ছদ্মবেশী বিদেশী, কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড়। দেবনটী ছিল তাঁর প্রণয়প্রার্থিনী।

সেই অতি-অভীপ্সিতা রমণীকে বিমুখ করে চলে এসেছেন জয়াপীড়। কারণ, ভোগ বিলাসের সময় তখন নয় বলে। তাকে

আশ্বাস দিয়ে এসেছিলেন, 'আমার অভিলাষ পূর্ণ হলে, তোমার অভিলাষও অপূর্ণ থাকবে না।'

পুণ্ড্রবর্ধনের রাজপ্রাসাদের সুসজ্জিত কক্ষে শয্যায় অর্ধশায়িত হয়ে অনেক কিছুই চিন্তা করছিলেন কাশ্মীরপতি। বর্ষাকাল সমাগত। গ্রীষ্মের দাবদাহ এখন কিঞ্চিৎ প্রশমিত।

পুণ্ড্রবর্ধনের নগরীর উপর বর্ষাসমাগমে সজল কালো ঘন মেঘের ছায়া। সেই ঘনায়মান অন্ধকার আকাশের দিকে অন্য মনে তাকিয়ে ছিলেন বিনয়াদিত্য।

শ্বশ্রূমাতার সস্নেহ তত্ত্বাবধানে দ্বিপ্রহরের আহার কিঞ্চিৎ গুরুভার হয়ে গেছে তাঁর। সুবর্ণ পালঙ্কের পাশে সুবর্ণ তাম্বুলপাত্রে কর্পূর ও সুগন্ধি মশলাযুক্ত তাম্বুল। একটি তাম্বুল চর্বন করতে করতে কাশ্মীরের তুষারাবৃত শিখর, সুরম্য উপত্যকা আর নীল জলরাশিপূর্ণ বেগবতী নদীর কথা মনে পড়ছিল, কাশ্মীররাজের।

সেই কক্ষে এলেন নববধূ, রাজকন্যা কল্যাণদেবী। অলঙ্কারের নিক্কণ তুলে স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। দেখলেন, বিনয়াদিত্য গভীর চিন্তায় মগ্ন।

রাজকন্যাকে কক্ষে আসতে দেখে ধীর, মৃদু পায়ে সেই কক্ষ থেকে বার হয়ে গেলো ব্যজনকারিনী পরিচারিকা।

রাজকুমারী দেখলেন, কাশ্মীরপতি তাঁর আগমন লক্ষ্য করেন নি। তিনি আগের মতোই অন্যমনা, চিন্তামগ্ন। রাজকুমারী আবার দেখলেন, কাশ্মীরপতির সুগৌর ললাটে চন্দন বিন্দুর মতো স্বেদ-বিন্দু। পরিত্যক্ত ব্যজনীখানি তুলে নিলেন রাজকন্যা। পালঙ্কের একপাশে বসে ব্যজন করতে লাগলেন স্বামীকে।

সেদিন বার বার কমলার মুখখানিই মনে পড়ছিল, বিনয়াদিত্য জয়াপীড়ের। তাঁর মন ছিল বড়ই বিষণ্ণ।

কমলাকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কাশ্মীরপতির অভিলাষ একে একে পূর্ণ হতে চলেছে।

তিনি রাজলক্ষ্মীস্বরূপিনী রাজকন্যাকে লাভ করেছেন। রাজকন্যা কল্যাণদেবী তাঁর সৌভাগ্যলক্ষ্মী।

আর কমলা?

সে রমণীও তাঁর সৌভাগ্য-স্বরূপিনী।

আশ্রয়হীন, সহায় সম্বলহীন অপরিচিত বিদেশীকে পরম সমাদরে যে গৃহে আতিথ্য দেয়, তার মহত্ব আর মাধুর্যের কোন উপমা নেই। কমলার গৃহে আশ্রয় না পেলে—হয়তো পথে-পথেই ঘুরতেন সহায়-সম্বলহীন কাশ্মীরপতি। মহাসিংহের অত্যাচারের সংবাদ তাঁর প্রথমে অজানা ছিল।

চমকিত হয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন কাশ্মীররাজ।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে স্বামীর চিন্তাকুল মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন মৃগনয়না রাজকুমারী। স্বামীকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে, তিনিও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ছিলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়াপীড় ভাবছিলেন আরো কত কিই যে দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো তাঁর জীবনে। অবশ্য তিনি ক্ষত্রিয় পুরুষ, যোদ্ধা। রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় পুরুষের জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো--অনিশ্চয়তা। রাজ্য-শাসনে—দিগ্বিজয়ে—শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে—সর্বক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা। রাজলক্ষ্মী বড়ই চপলা, সৌভাগ্যলক্ষ্মীও ততোধিক।

জয়াপীড়ের চিন্তাস্রোতে এই পরিবর্তন শুধু ক্ষণিকের জন্যই। পরমুহূর্তেই অনুশোচনায় মন ভরে উঠলো। অপরাধী মনে হলো নিজেকে।···

কিন্তু যে রমণী এমন নিঃস্বার্থভাবে তাঁকে বিপদের দিনে আশ্রয় দিয়েছিল, তাঁর অমঙ্গলের আশঙ্কায় হয়ে উঠেছিল ভীষণ উদ্বিগ্ন, অধীর—এই নিখাদ ভালোবাসার প্রতিদানে, সে রমণী কি পেয়েছে তাঁর কাছে?

প্রণয়ার্থিনী রূপবতী রমণীকে প্রত্যাখ্যান করা পুরুষের ধর্ম নয়।

বিশেষ করে যে প্রণয় অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। মহাকাব্য মহাভারতের একটি কাহিনী মনে পড়ে গেলো বিনয়াদিত্যের।

তিনি তখন কিশোর মাত্র। কাশ্মীরের বৃদ্ধ সভাপণ্ডিত—তাঁর ধর্মপ্রাণ জ্যেষ্ঠতাত কুবলয়পীড়ের আদেশে কাশ্মীর রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরিকাদের অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।

কিশোর বিনয়াদিত্যও শুনেছিলেন সে পাঠ।

দেবরাজ ইন্দ্রের আমন্ত্রণে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন গিয়েছিলেন স্বর্গলোকে। নিঃসঙ্গ অর্জুনের একাকীত্ব দূর করে, তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র পাঠালেন অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীকে। অর্জুন অপ্সরাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তিনি পুরুকুল-জননী পূর্বপিতামহী বলে। আসঙ্গ কামনায় কাতরা উর্বশী অর্জুনকে অভিশাপ দিয়েছিল—নপুংসক হবে বলে।

কমলার প্রণয় তো তাঁর কাঙ্ক্ষিত। তবু সময় তখনও আসে নি বলে, তার কামনা পূর্ণ করা সম্ভব হয় নি। তাকে বিমুখ করেছিলেন কাশ্মীরপতি।

তাঁর মহত্বকে সম্মান দিয়ে চলে গিয়েছিল কমলা। কোন কথাই বলেনি সে, অভিসম্পাত তো দূরের কথা।

প্রিয়বাদিনী, প্রিয়দর্শিনী দেবনর্তকীর জন্য আজ তাঁর চিত্ত বড় চঞ্চল হয়ে উঠছে। তিনি তো সবই পেয়েছেন। পুণ্ড্রবর্ধন রাজার অসীম মহানুভবতা। তিনি রাজ্যহারা নৃপতিকে সমাদর করে বরণ করেছেন। তাঁর হাতে সম্প্রদান করেছেন একমাত্র পরম রূপবতী, গুণবতী কন্যাকে। সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দিয়েছেন। সে কাজও চলেছে পূর্ণোদ্যমে। প্রিয় সহচর সেনাপতি দেবশর্মাও বিশ্বস্ত অনুগত কাশ্মীরী সেনাবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত।

তা ছাড়া, দেবশর্মা তাঁকে জানিয়েছেন, কাশ্মীররাজ্যে ও রাজার অনুকূলে সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। সেনানায়ক দেবশর্মার বিশ্বস্ত অনুচরেরা সে কাজ প্রায় সমাধা করে এনেছে।

পূর্বদেশে তাঁর যা প্রার্থিত—সবই এখন তিনি লাভ করেছেন। তাঁর সব অভিলাষ এখানে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেন নি এখনও। কমলার অভিলাষ তিনি পূর্ণ করবেন বলে বিদায়কালে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাকে।

পরম রূপবতী, কলানিপুণা দেবনটীর প্রতি তাঁর মনেও যে প্রবল অনুরাগ রয়েছে—তা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন কাশ্মীরপতি। নীরব, অভিমানিনী এবং আশ্রয়দাত্রী প্রেয়সীর জন্য আজ তাঁর প্রাণ-মন বড়ই অস্থির। এতদিন অতিবাহিত হয়েছে, কমলার কোন সংবাদই তিনি নিতে পারেন নি। একবারও তিনি যেতে পারেন নি দেবনটীর গৃহে। এর জন্য নিজেকেই যেন ক্ষমা করতে পারছেন না, বিনয়াদিত্য।

বাতায়নপথে বর্ষার নবীন মেঘে আচ্ছাদিত প্রায়-অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কাশ্মীরপতি। তারপর চোখ ফেরালেন কক্ষের মধ্যে। দেখলেন, নবপরিণীতা বধূ ব্যজন করছেন তাঁর পদতলে বসে।

মৃগলোচনা রাজকন্যার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। রাজকন্যা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তাঁরই মুখের পরে।

রাজবধূর দিকে চোখ পড়তে বিনয়াদিত্য হাসলেন।

রাজবধূ কল্যাণদেবীও মধুর হেসে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। স্বামীকে চিন্তিত এবং অন্যমনস্ক দেখে—তিনিও মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন।

'কি ভাবছিলেন, আর্যপুত্র?' স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, রাজবধূ কল্যাণদেবী।

'প্রিয়তমে—' বলে বিনয়াদিত্য বধূর কোমল দেহলতাটি আকর্ষণ করলেন নিজের দিকে। পদতল ছেড়ে স্বামীর বক্ষের কাছে এগিয়ে এলেন স্বামী-গরবিনী রাজকন্যা।

'প্রিয়তমে, আমি ভাবছিলাম অনেক কথাই। এখন, আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করবো। তুমি সঠিক উত্তর দাও', বললেন কাশ্মীরপতি। তাঁকে সামান্য গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

রাজকন্যা আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন। স্বামী তাঁকে কি প্রশ্ন করবেন!

'প্রিয়ে, একটি কথা বল তো—' রাজকন্যাকে একটি হাতে নিজের কাছে টেনে রেখে প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলে চললেন জয়াপীড়। 'রাজ্য-ভ্রষ্ট এই হতভাগ্য নরপতিকে তোমার পিতা সম্মানিত করেছেন, তোমার মতো রূপবতী ও গুণশালিনী কন্যারত্নকে সমর্পণ করে। রাজ্য ফিরে পাবার জন্য আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। সেজন্য শক্তিশালী বাহিনীও প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু রাজনন্দিনী, যুদ্ধের জয়-পরাজয় এখনও অনিশ্চিত। যদি সম্মুখ রণে পরাজিত হই আমি—যদি—'

দক্ষিণ হাতের কোমল অঙ্গুলি তুলে—স্বামীর ওষ্ঠে রাখলেন রাজকন্যা। বিনয়াদিত্যের কথা বন্ধ হলো। তারপর দুটি হরিণ নয়ন তুলে স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, 'স্বামিন্, আমরা ক্ষত্রিয় রমণী। সৌভাগ্যের দিনেও স্বামীর পাশেই আমাদের স্থান, দুর্ভাগ্যের দিনেও সেই স্থান ত্যাগ করি না আমরা। তবে এও জানি, ক্ষত্রিয় বীরের জীবনে দুর্ভাগ্যের কাল ক্ষণস্থায়ী। ক্ষাত্র তেজ, ক্ষাত্র বীর্যের দ্বারাই সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁদের করায়ত্ত হন। আপনি বৃথাই উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন।'

কাশ্মীরপতি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন নবপরিণীতা রাজবধূর দিকে।

কোমলভাষিণী রাজপুত্রীর অন্তঃকরণের দৃঢ়তার পরিচয়ে তিনি বিশেষ উল্লসিত হলেন। ক্ষত্রিয় রমণীর উপযুক্ত কথাই তিনি বলেছেন। পরম পুলকিত কাশ্মীরপতি বধূকে বক্ষে আকর্ষণ করে, বার বার তাঁর মুখে চুম্বন করলেন।

স্বামী সোহাগিনী রাজবধূ—নীরবে স্বামীর বক্ষে মাথা রেখে অর্ধশায়িত হয়ে এক নিরাপদ আশ্রয়ের স্বস্তি অনুভব করলেন।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর জয়াপীড় আকস্মিক ভাবপ্রবণতার সঙ্গে বললেন, 'প্রতিজ্ঞা পালনও ক্ষাত্রবীরের ধর্ম, রাজনন্দিনী।'

'অবশ্যই, বলে উঠলেন রাজবধূ। 'প্রতিশ্রুতি রক্ষা বীরের ধর্ম, বীরের কর্তব্য।'

'বীরের ধর্ম, বীরের কর্তব্য!' অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, কাশ্মীরপতি। 'কিন্তু রাজনন্দিনী, আমার একটি প্রতিশ্রুতি পালন করা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠে নি।'

'কাব কাছে আপনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, স্বামিন্?' জিজ্ঞাসা করলেন রাজপুত্রী, বিস্মিত হয়ে। 'প্রতিশ্রুতি পালন করুন। বাধা কোথায়?'

'প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমি এক অসামান্যা রমণীর কাছে। তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমার অভিলাষ পূর্ণ হলে, তার অভিলাষও অপূর্ণ থাকবে না।' ধীরে ধীরে বললেন বিনয়াদিত্য।

জিজ্ঞাসু নেত্রে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন রাজনন্দিনী। এক অসামান্যা নারীর কাছে তাঁর স্বামী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কি সেই প্রতিশ্রুতি? কিসের অভিলাষ? কে সেই রমণী? রাজনন্দিনীর মনের ভিতর প্রবল ঢেউ উঠলো যেন। চঞ্চল হলো বুকের রক্ত।

এমন নারী কে হতে পারে? কমলা—? হঠাৎই মনে হলো তাঁর।

—'কমলা। দেবনর্তকী।' রাজকন্যার মনের কথা শব্দময় রূপ পেলো কাশ্মীরপতির মুখে। প্রায়ান্ধকার কক্ষে রাজবধূ স্বামীর মুখভাব ভালো করে দেখতে পেলেন না। কেবল কানে ভেসে এলো, বিষাদগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

চিত্রমতিকা সেই কক্ষে এলো সুবর্ণ দীপ জ্বালাতে। রাজকন্যা এবং কাশ্মীরপতি গভীর আলোচনায় মগ্ন দেখে, সান্ধ্যপ্রসাধনের প্রসঙ্গ তুললো না। কোন রঙ্গ রসিকতাও করলো না। দীপ জ্বেলে দিয়ে নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলো সে।

সুবর্ণদীপের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত হলো রাজকন্যার কক্ষ। দীপশিখার আলো পড়লো কাশ্মীরপতির পরমসুন্দর সুবর্ণ-গৌর ললাটে, উন্নত নাসায়, ওষ্ঠে, চিবুকে। রাজকন্যা দেখলেন, স্বামীর মুখ বড়ই গম্ভীর, বড়ই বিষণ্ন।

'রাজকন্যা'। দীপশিখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আবেগভরে বললেন কাশ্মীরপতি, 'রাজকন্যা, পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর কার্তিকেয় মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী কমলার কাছে আমি ঋণী। অপরিচিত, নিরাশ্রয় পথিক ছিলাম আমি। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ছিলাম কাতর। কমলা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, দিয়েছিল সাহচর্য, প্রেম, ভালোবাসা। মহাসিংহের সঙ্গে সংগ্রামের পর আমার রক্তাক্ত দেহ দেখে, সে হয়ে উঠেছিল উৎকণ্ঠিত। গভীর মমতায় শুশ্রূষা করেছিল সে রাতে।'

কল্যাণদেবী স্বামীর বক্ষে মাথা রেখেই শুনছিলেন, স্বামী কেমন গভীর স্বরে কথাগুলি বলছিলেন। এবার তিনি উঠে বসলেন কাশ্মীরপতির মুখোমুখি। রাজকন্যার মুখে ঈর্ষা বা অশান্তির চিহ্ন লেশমাত্র নেই।

জয়াপীড় তাঁর দিকে তাকিয়ে গাঢ় স্বরে বলে উঠলেন, 'রাজকন্যা কল্যাণদেবী! আমি কমলার কাছে চিরঋণী। তার প্রতি কৃতঘ্নতা আমার মৃত্যুতুল্য। কমলার প্রেম আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদ। বিনিময়ে তাকে আমি কিছুই দিই নি।'

রাজকুমারী কল্যাণদেবীর ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির রেখা দেখা দিলো। সে বিচিত্র হাসির অর্থ বুঝলেন না জয়াপীড়।

তিনি কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইলেন রূপবতী নবপরিণীতা বধূর দিকে। তারপর স্খলিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি তোমাদের উভয়ের প্রতিই অনুরক্ত। রাজনন্দিনী, তুমি আমার কল্যাণ, তুমি আমার সৌভাগ্যস্বরূপিনী, রাজলক্ষ্মী। আর কমলা আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রেখেছে, অযাচিত প্রীতি ও প্রেমে। সে আমার প্রেয়সী।'

এ কথা শুনেও কল্যাণদেবীর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেলো না। সেই রহস্যময় সূক্ষ্ম হাসি লেগেই রইলো রাজবধূর ওষ্ঠপ্রান্তে। তাঁর মনে পড়ে গেলো কিছুদিন পুর্বের এক আশ্চর্য স্বপ্নের কথা। গ্রহাচার্য গণনা করে কি বলেছিলেন তাঁকে? গ্রহাচার্য বলেছিলেন,

'রাজনন্দিনী, তোমার জীবনের পরম লগ্ন এগিয়ে এসেছে। তোমার বিবাহের শুভক্ষণ সমাগত। এক রাজচক্রবর্তী পুরুষ দৈবপ্রেরিত হয়ে আসছেন তোমার জীবনে। বিবাহের পর উত্তর দিকে হবে তোমার শুভযাত্রা। তবে শুনে রাখো, রাজকন্যা, এই দেশেরই আরও এক রমণীও হবে তোমার প্রণয়ভাগিনী। তোমার স্বামী উভয়ের প্রতি থাকবেন অনুরক্ত।'

বধূ কল্যাণদেবীর মুখের রহস্যময় হাসি দেখে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়েছিলেন কাশ্মীরপতি। মনে দ্বিধা আর উদ্বেগ নিয়ে তিনি তাকিয়ে ছিলেন বধূর দিকে। কিন্তু তাঁকে আশ্চর্য করে দিলেন, কল্যাণদেবী।

'প্রভু! যিনি আপনার আশ্রয়দাত্রী, যিনি আপনার মঙ্গল কামনা করেন, তিনি আমারও প্রীতিভাজনা।' স্নিগ্ধ স্বরে কথাগুলি বললেন, রাজবধূ। একটি হাত রাখলেন কাশ্মীরপতি জয়াপীড়ের হাতের উপরে।

স্বামীর মুখের দিকে তাঁর কোমল দৃষ্টি তুলে—মধুর কণ্ঠে বলে চললেন, 'তা ছাড়া, দেবনর্তকীই তো পিতার কাছে আপনার এই নগরীতে অবস্থানের সংবাদ প্রেরণ করেছিল। সেজন্যও কমলার কাছে আমি ঋণী।' কথা শেষে, মুখ অবনত করলেন রাজনন্দিনী।

কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে কল্যাণদেবী আবেগমথিত হৃদয়ে বললেন, 'প্রতিশ্রুতি পালন করা বীরের ধর্ম। আপনি তার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' তারপর সামান্য হেসে বললেন, 'পিতাও প্রতিশ্রুত। যে আপনার সংবাদ দেবে, তার অভিলাষ পূর্ণ করবেন, বলেছিলেন পিতা। কমলা তো আপনার সংবাদ দেবার জন্যও পিতার কাছে কোন কিছুই প্রার্থনা করে নি।'

পুনরায় বলতে বলতে যেন রাজনন্দিনীর কোমল কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারাক্রান্ত হয়ে এলো, 'কমলার অন্তরে এমটিমাত্রই প্রার্থনা, এবং সে প্রার্থনা—আপনি স্বয়ং। এ কথা দেবনটী পিতাকে কি নিজের মুখে জানাতে পারে?'

জয়াপীড় মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকালেন রাজবধূ কল্যাণদেবীর দিকে। তাঁর যেন বিস্ময়ের সীমা ছিল না। গৌড়ললনারা কি বুদ্ধিমতী! কত মহৎ হৃদয় তাদের! কল্যাণদেবীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাঁর তাপিত হৃদয়কে কথঞ্চিৎ শান্ত করলো।

তিনি অত্যন্ত প্রীত হলেন কল্যাণদেবীর মধুর ভাষণে। নারীর হৃদয়ের কথা, নারীই বোঝে ভালো। তাই বোধহয় কমলার মনের কথা কল্যাণদেবী উপলব্ধি করেছেন যথার্থভাবে।

একদৃষ্টে স্বামীর মুখের ভাব নিরীক্ষণ করছিলেন কল্যাণদেবী। এবার স্মিত মুখে বললেন, 'স্বামিন্, এবার আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। পিতাকেও প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্ত করুন। কমলাকে গ্রহণ করে, তাকেও কাশ্মীরে নিয়ে চলুন, আর্যপুত্র!'

'কল্যাণী! তুমি তোমার পিতার মতোই মহৎ এবং উদার হৃদয়ের অধিকারিণী। তোমাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কি করে আমার প্রতিশ্রুতি রাখবো, এ নিয়ে বড় চিন্তা ছিল আমার মনে। তোমার কথায় আজ বিশেষ আশ্বস্ত হলাম, রাজনন্দিনী। মনের শান্তি ফিরে পেলাম।'

পুষ্পপাত্র থেকে একটি পদ্মকোরক তুলে নিয়েছিলেন রাজকন্যা। নতমুখে চম্পক-অঙ্গুলিতে সেই পদ্মকোরকের দলগুলি তিনি ধীরে ধীরে খুলে দিচ্ছিলেন। এবার মুখ তুলে বললেন, 'আর্যপুত্র, কাশ্মীর যাত্রার আগে পিতা আপনাকে বিশেষ যৌতুক দেবার প্রস্তাব করবেন। আপনি বিশেষ যৌতুক স্বরূপ দেবনটী কমলাকে প্রার্থনা করবেন।'

কথা শেষে মুখটি আরো নত করে, রাজকন্যা কল্যাণদেবী একটি দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন।

বিনয়াদিত্য জয়াপীড় সবিস্ময়ে তাকালেন পত্নীর দিকে। তাঁর চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত। দেখলেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজকন্যার মুখে রহস্যময় সূক্ষ্ম হাসি লেগেই আছে।

নিঃশ্বাস ফেলে কাশ্মীরনাথ জয়াপীড় বলে উঠলেন, 'রাজনন্দিনী,

তোমার তুলনা নেই!' তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সাহায্য করলে। তুমি আমার যথার্থ, সহধর্মিনী। কত অনায়াসে সব সমস্যার সমাধান করে দিলে, তুমি!'

কল্যাণদেবী স্বামীর উচ্ছ্বাসে বিচলিত না হয়ে আবার বললেন, 'এ সুসংবাদ আপনি কমলাকে স্বয়ং দিলেই ভালো হয়। আপনি অনুমতি করলে, রথ প্রস্তুত করতে আদেশ দিতে পারি।'

বধূর বিচক্ষণতায় আর মধুর ব্যবহারে উত্তরোত্তর মুগ্ধ হচ্ছিলেন, বিনয়াদিত্য জয়াপীড়। কল্যাণদেবীকে সপ্রেমে আকর্ষণ করলেন নিজের কাছে। বার বার তার মুখ চুম্বন করলেন।

প্রগাঢ় স্বরে বললেন, 'রাজনন্দিনী! আমি ছলনার আশ্রয় নিতে চাই নি। কমলার গৃহে গোপনে হয়তো যেতে পারতাম। তার কামনা পূর্ণ করাও সহজ ছিল আমার পক্ষে। কারণ, কমলা আমাকে অবিশ্বাস করে না। কিন্তু কোন রকম বঞ্চনার পথে যেতে আমার প্রবৃত্তি হয় নি। তাই এতদিন কমলার সঙ্গে দেখা করতেও পারি নি। প্রেমের মহত্ব ছলনায় নষ্ট হয়। তা ছাড়া, রাজকন্যা, আমি তোমাকেই বা ছলনা করবো কি করে? তোমার পিতা নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করে, আমাকেই সম্প্রদান করেছেন, তাঁর একমাত্র কন্যারত্নটিকে। সে বিশ্বাসের মূল্যও তো আমাকে দিতে হবে।'

রাজবধূর চিবুক তুলে ধরে, তাঁর ওষ্ঠে চুম্বন করলেন বিনয়াদিত্য। 'তোমার সম্মতি আমাকে আজ পরম নিশ্চিন্ত করেছে।' বলে, নিজেও যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

স্বামীর বাহুবন্ধনের মধ্যে গর্বে, আনন্দে শিহরিত হলো রাজকন্যার পেলব দেহলতাটি। তাঁর স্বামীর মহৎ এবং উদার চরিত্রের পরিচয় পেয়ে তিনি নিজেকে বার বার ধন্য মনে করলেন।

স্বামীর দেহের দিকে কিছুক্ষণ স্মিত মুখে তাকিয়ে রইলেন রাজনন্দিনী। তারপর পরিচারিকাদের ডাক দিলেন।

রাজকন্যার ডাকে ত্রস্ত হয়ে ছুটে এলো পরিচারিকারা।

রাজকন্যা আদেশ দিলেন, 'রথ প্রস্তুত করতে বলো। কাশ্মীরপতি নগর ভ্রমণে যাবেন।'

কাশ্মীরপতি নগর ভ্রমণে বার হবার পর, প্রাসাদের অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন কল্যাণদেবী। অন্যমনে তিনি তাকিয়ে রইলেন দূর নগর-সৌধগুলির দিকে। তাঁর স্বামী কাশ্মীরপতির প্রেয়সী কমলার বাস ঐ অংশেরই একটি গৃহে।

স্বামীর প্রেমের অংশভাগিনী অন্য রমণীটির প্রতি কি তাঁর মনে কোন ঈর্ষা জেগেছে? নিজেকেই প্রশ্ন করলেন রাজকুমারী। তাঁর মুখে হাসির রেখা জেগে ওঠে। 'সামান্য রমণীদের মনের কথা তো জানি না। তবে আমরা ক্ষত্রিয় রমণী, রাজকন্যা, রাজবধূ।' নিজেই প্রশ্নের উত্তরও দিলেন রাজকন্যা। স্বামীর একাধিক পত্নী ও উপপত্নী অথবা প্রেয়সী? রাজপরিবারে এ তো অতি স্বাভাবিক ঘটনা! জন্মাবধি এমনটিই তো ঘটতে দেখেছেন, ঘটতে শুনেছেন। তাহলে? তা ছাড়', এ রমণী তাঁর স্বামীর আশ্রয়দাত্রী, শুভাকাঙ্ক্ষিনী। নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় মুগ্ধ করেছে কাশ্মীরপতিকে। সে রাজনন্দিনী কল্যাণ-দেবীরও কৃতজ্ঞতার পাত্রী।

আবার তাঁর মনে পড়ে গেলো স্বপ্নের কথা। গ্রহাচার্যের গণনার কথা।

'ভবিতব্যকে মেনে নেওয়াই ভালো।'

ত্রিশ

প্রখর গ্রীষ্ম উত্তীর্ণ হয়ে গেলো।

ঋতুচক্রের আবর্তনে শেষ হলো একটি ঋতু।

এলো বর্ষা।

পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর আকাশ বর্ষার ঘন মেঘে কালো হয়ে এসেছে।

কমলার গৃহপালিত শিখী – রঙীন পেখম মেলেছে, নৃত্য-চঞ্চল হয়েছে, বর্ষা সমাগমে।

কমলা অঙ্গনে বসে তার কপোলে হাত রেখে তাই দেখছিল।

গ্রীষ্ম গেলো। এলো বর্ষা। বর্ষা কেটে শরৎ আসবে। এইভাবেই কেটে যাবে মাসের পর মাস। বৎসরের পর বৎসর।

কমলার নিঃসঙ্গ জীবনে পড়বে মহাকালের ছায়া। তার রূপ, যৌবন, কোকিলবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর, নৃত্য-কুশলতা—সবই মিলিয়ে যাবে কালচক্রের অতলে।

এখন কমলা বড় ক্লান্ত।

কমলা পীড়িত। দেহে যতো নয়, মনে আরো বেশি।

দেবমন্দিরে নৃত্য-গীতের আসর থেকে সে অবসর চেয়ে নিয়েছে কিছুদিনের জন্য। বৈদ্য তাকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন।

বৃষ্টিপাত শুরু হলো।

কমলা অঙ্গন থেকে উঠে এলো তার কক্ষে। দীপহীন অন্ধকার কক্ষে, শুয়ে রইলো নিঃসঙ্গ শয্যায়।

থেকে থেকেই একখানি মুখ শয়নে স্বপনে তার মানসপটে ভেসে ওঠে। তাকে বিস্মৃত হতে চায় না কমলা, কোন মতেই। বরং দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়, তার মানসপটে এ অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষমূর্তি যেন চির-উজ্জ্বল, চির-অম্লান থাকে।

অতি প্রিয় সেই পুরুষমূর্তির কল্পনায় কমলার চক্ষু সজল হলো।

রৌপ্য দীপাধারে সুবাসিত দীপ নিয়ে ত্রস্তপদে তার কক্ষে এলো মাধবী আর চতুরিকা। কণ্ঠে তাদের আনন্দের আবেগ।

—'দেবী উঠুন, দেখুন চোখ মেলে—'

তবু চোখ মেলে না কমলা। যদি মানসপটে মুছে যায় সেই অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষ মূর্তি।

—'কমলা। আমি এসেছি—'

কমলা কি স্বপ্ন দেখছে?

কমলা স্বপ্নের মধ্যে শুনতে পেলো কি তার অতি প্রিয় পরিচিত কণ্ঠস্বর!

—'কমলা, মানিনী কমলা—'

এবার চকিতে শয্যার পরে উঠে বসে কমলা। এ'তো স্বপ্ন নয়! এ কার কণ্ঠস্বর?

উজ্জ্বল দীপালোকে কমলার চোখে পড়লো, সুবর্ণকান্তি রূপবান তার—পরমবাঞ্ছিত, মনোহর, প্রিয় পুরুষকে। কমলার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। উজ্জ্বল চোখে, মধুর হাসিতে ভরা মুখে তাকিয়ে আছেন কমলারই দিকে।

ত্বরিতে শয্যা ছেড়ে সেই প্রিয়তমের পায়ে নত হলো কমলা। আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের দুটি চরণ তার কোমল দুটি হাতে জড়িয়ে ধরলো। অপ্রত্যাশিত আনন্দের চমকে তার চোখে অশ্রুস্রোত বহে গেলো।

—'রাজজামাতা, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।'

'মানিনী, তোমার স্থান আমার চরণে নয়, আমার বক্ষে!' প্রণয়স্নিগ্ধ চোখে এবং স্মিত মুখে বললেন, কমলার বাঞ্ছিত পুরুষ। বলতে বলতে দু'হাতে কমলার কম্পিত দেহবল্লরী আকর্ষণ করে, নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন তাকে।

দয়িতের প্রশস্ত বক্ষে মুখ লুকিয়ে আকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে কমলা।

অস্ফুট অভিমানাহত কণ্ঠে বার বার বলতে থাকে, 'কাশ্মীরপতি, এ্যদিনে অভাগিনী কমলার কথা মনে পড়লো ?'

অভিমানিনী প্রেয়সীর কথায় হাসলেন কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য। গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে কমলার মাথায় হাত বুলিয়ে, তিনি মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'তুমি অভাগিনী নও, কমলা। তুমি কাশ্মীরপতির প্রেয়সী। প্রেমাস্পদা.'

একথা শুনে যুগপৎ বিস্ময়ে এবং আনন্দে অভিভূত হয়ে জয়াপীড়ের বুকের থেকে মাথা তুললো, কমলা। প্রদীপের আলোয় অপলক নয়নে দেখতে লাগলো প্রেমাস্পদের মুখখানি। স্বর্গের সুষমামণ্ডিত এই তেজস্বী পুরুষকে দেখে দেখে যেন তার আশা মিটলো না। যতোই দেখে ততোই এই পুরুষ যেন প্রিয় থেকে প্রিয়তর, প্রিয়তম হয়ে ওঠে। কমলা যেন অন্য এক জগতে চলে যায়।

তারপর তার খেয়াল হলো নিজের কথা। তার দুটি চোখ অবিরাম অশ্রুপাতে রক্তিম। কেশরাশি সযত্ন পরিচর্যার অভাবে রুক্ষ, অবিন্যস্ত। পরিধানের মহার্ঘ বস্ত্রটিও ততোধিক অবিন্যস্ত। এমন উন্মাদিনীর মতো বেশে কাশ্মীরপতি তাকে দেখে কি ভাবলেন ? কে জানে ?

কমলার মনের ভাব বুঝতে পেরে সকৌতুকে জয়াপীড় বলে উঠলেন, 'তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, কমলা। বিমুখ করবে না তো ?'

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয় দেবনর্তকী। সামান্য দেবনটীর কাছে কাশ্মীর-পতির কিইবা প্রার্থনা থাকতে পারে ?

'কমলা! বর্ষাশেষে শরতের প্রারম্ভে আমাদের কাশ্মীর যাত্রার শুভদিন ধার্য হয়েছে। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। তোমার অনুমতি পেলে, পুণ্ড্রবর্ধনরাজের কাছে যৌতুকরূপে তোমাকে প্রার্থনা করবো। আশা করি, এ প্রস্তাবে দেবনর্তকীর আপত্তি নেই। আমি নিশ্চয় জানি, রাজা জয়ন্ত আমার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখবেন না।' বলে হাসলেন বিনয়াদিত্য।

এই কথা শুনে, বিনয়াদিত্যের বাহুবন্ধনে কেঁপে উঠলো কমলার সুকুমার দেহলতাটি। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কমলা। এত মহৎ তার এই বিদেশী দয়িত! অশ্রুপ্লাবিত মুখে সে সচকিতে তাকায় জয়াপীড়ের দিকে। সে মুখ পবিত্র হাস্যে উদ্ভাসিত, কৌতুকোজ্জ্বল!

কমলার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিত হলে জয়াপীড় স্নিগ্ধ স্বরে গভীর মমতার সঙ্গে বললেন, প্রিয়তমে, 'তুমি শুনে সুখী হবে, রাজনন্দিনীরও এই বাসনা।'

কমলা হৃদয়ে সংশয়ের কুয়াশাকে দূর করার প্রচেষ্টায় সবিস্ময়ে তাকালো জয়াপীড়ের দিকে। উপলব্ধি করলো যে এই প্রস্তাব নিছক পরিহাসই নয়, এ প্রস্তাব বাস্তব এবং সত্য। এই অনুভূতিকে জয়যুক্ত করতেই যেন জয়াপীড় আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'প্রিয়দর্শিনী, তোমাকে আমি বলেছিলাম, আমার মনোবাসনা পূর্ণ হলে তোমার অভিলাষও অপূর্ণ থাকবে না। মনে পড়ছে?'

এই বলে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কমলাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কাশ্মীরপতি গভীর আবেগে বার বার চুম্বন করলেন কমলার কপালে, মুদিত চোখে, ওষ্ঠে, গ্রীবায়।

তারপর ধীরে ধীরে কমলার শয্যায় উপবেশন করলেন জয়াপীড়। প্রেমপূর্ণ নয়নে কমলার ইপ্সিত দেহটির প্রতি গভীর আসক্তির নিদর্শন-স্বরূপ, তিনি তাকে নিজের পাশে বসালেন। তারপরে নিজের সুন্দর মুখখানি প্রেয়সীর অপ্রশস্ত মসৃণ ললাটের উপর রেখে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে ভাবাবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'তোমাকে চিরপ্রেয়সী রূপে পেতে চাই আমি।'

এই বলে কমলার গলায় পরিয়ে দিলেন নিজের গলার বহুমূল্য মুক্তাহার।

সঙ্কোচে লজ্জায় শিহরিত হলো কমলা।

তার চোখের কোল ছাপিয়ে নামলো দুকূলব্যাপী বন্যা। চোখের জলে অস্পষ্ট হয়ে গেলো কাশ্মীরপতির সহাস্য মুখখানি।

বাম হাতে কমলাকে কাছে নিয়ে এলেন জয়াপীড়।

'—কমলা! শরতের শেষে আমরা যাত্রা করবো কাশ্মীর অভিমুখে, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। জানি না সেখানে অদৃষ্টে কি ঘটবে! কিন্তু পুরুষকার ক্ষত্রিয়ের বল। সেই মনোবল সম্বল করেই তোমাদের নিয়ে যাত্রা করবো স্বদেশের উদ্দেশে। ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে।'

'মহারাজ, আমাকে গ্রহণ করে, ধন্য করেছেন এই দেবনটীকে। আর আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? আমি তো আপনারই ছায়া-সঙ্গিনী। আপনার অদৃষ্টে যা ঘটবে—তা আমারও অদৃষ্ট! কাশ্মীরপতি, এখন থেকে আপনার সুখই আমার সুখ—আপনার দুঃখই আমার দুঃখ।' মধুর কণ্ঠে বলে উঠলো, ভাববিহ্বলা কমলা। 'তবে আপনার জয় সুনিশ্চিত। দেব সেনাপতি কার্তিকেয়র কাছে দিবারাত্রি আপনার বিজয় কামনা করে চলেছি। দেব সেনাপতি স্বয়ং আপনার সহায় হবেন। এতোদিন দেবতার মন্দিরে নৃত্যগীত পরিবেশন করে এসেছি, দেবতা আমার প্রার্থনা শুনবেন নিশ্চয়।'

কমলার অকপট উক্তি আর সরল বিশ্বাসের অভিব্যক্তিতে সন্তুষ্ট হলেন কাশ্মীররাজ। গৌড়ললনারা সকলেই কত অনুরাগবতী! প্রেমাস্পদের উপরে তাদের কি গভীর বিশ্বাস আর পরম নির্ভরশীলতা! আবার তিনি সপ্রেম চুম্বন করলেন কমলাকে।

প্রিয়তমের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ দেবনটী ভাবছিল, একি ঘটে চলেছে তার জীবনে! একি স্বপ্ন না মায়া? যাঁর চিন্তায় দিবারাত্রি রত ছিল সে, সেই বাঞ্ছিত, প্রিয় পুরুষ কাশ্মীরপতি স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন তার গৃহে!

কমলা তখন বারবার ধিক্কার দিলো নিজেকে। আজ সে প্রসাধন করে নি। পরে নি বহুমূল্য অলঙ্কার। চন্দনের পত্রলেখা আঁকে নি কোমল কঠিন বক্ষে। গন্ধ তৈলে স্নিগ্ধ করে নি অপর্যাপ্ত ঘনকৃষ্ণ

কেশরাজি। পদ্মপলাশ নয়নে নেই কাজল, ওষ্ঠে নেই লালিমা, মূল্যবান অলঙ্কৃত বসনে সাজায় নি তার দেহ।

আজই এলো তার জীবনের প্রিয়মিলনের শুভলগ্ন!

শয়নকক্ষের শয্যায় জয়াপীড়ের নিবিড় বাহুবন্ধনে জগৎ সংসার সবই ভুলে যায়, দেবনর্তকী কমলা।

॥ একত্রিংশ ॥

ঘটনাকাল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ।

গ্রহাচার্যের নির্দেশমতো শুভ দিনে, শুভ ক্ষণে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রার উদ্যেগ করলেন বিনয়াদিত্য জয়াপীড়।

বর্ষা শেষ হয়েছে। শরতের শুরু।

সজল নয়নে কন্যা আর জামাতাকে বিদায় দিলেন রাজা জয়ন্ত এবং রাজমহিষী।

সজল নয়নে সখী আর অন্তঃপুরিকাদের কাছে বিদায় নিলেন কল্যাণদেবী।

'জয়স্তু' বলে আশীর্বাদ জানালেন ব্রাহ্মণেরা। পুরোহিতেরা স্বস্তিবচন করলেন।

রাজদ্বারের দু'পাশে মঙ্গল ঘট। দ্বার-শীর্ষ আম্রপল্লবে সজ্জিত করা হয়েছে। শুভযাত্রার প্রতীক।

তূরী ভেরী বেজে উঠলো।

পুণ্ড্রবর্ধনের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চার-অশ্ব বাহিত রথে এগিয়ে চললেন, কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড়।

তাঁর পিছনে দুটি রাজশিবিকায় চললেন, রাজবধূ মৃগনয়না কল্যাণদেবী এবং রাজপ্রেয়সী প্রিয়দর্শিনী কমলা।

মাধবীও চলেছে কমলার সঙ্গে। কোনমতেই কমলা তাকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। স্বামিনীর বড় অনুগতা সে।

তাদের পিছনে রসদ এবং সাজ ও সরঞ্জামসহ সুনিয়ন্ত্রিত বিশাল সেনাবাহিনী। কাশ্মীরী সেনা আর শক্তিশালী গৌড় সেনাবাহিনী: বাহিনীর সামনে সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে, সেনাপতি দেবশর্মা।

রাজপথের দুপাশে উৎসুক জনতার কণ্ঠ কাশ্মীরপতির জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠছে।

রাজজামাতার যাত্রাপথের মঙ্গল কামনা করে পুরনারীরা শঙ্খধ্বনি করলেন। শোভাযাত্রার উপরে লাজ বর্ষণ করলেন।

বিনয়াদিত্যের বাহিনী রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর সীমানা ছাড়িয়ে গেলো।

সেনাপতিকে নির্দেশ দেওয়া ছিল কাশ্মীরপতির। পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের সীমানায় শঙ্কর কর্মকারের গৃহপার্শে অল্পকালের জন্য যাত্রার বিরতি হলো।

যে পথ ধরে ধরে বিনয়াদিত্যের বিরাট বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল, উৎসুক গ্রামবাসীরা গৃহকাজ ফেলে সেই রাজপথের পাশে এসে দাঁড়ালো, ভাল করে রাজজামাতাকে দেখবে বলে।

রাজপথের জনতার জটলা থেকে কয়েকজন রাজ-অনুচর শঙ্কর কর্মকারকে নিয়ে এলো কাশ্মীরপতির সামনে।

রথ থেকে অবতরণ করলেন কাশ্মীরপতি।

শঙ্কর কর্মকার বিস্ময়ে বিমূঢ়। অতিমাত্রায় ভয় পেয়েছে সে। যথাসাধ্য সাজসজ্জা করে শোভাযাত্রা দেখতে এসেছিল কর্মকার। তার পিছনে, শিশু পুত্র কোলে নিয়ে, দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টেনে কর্মকারপত্নী। ভয়ে তার মুখেও কথা সরছে না।

রাজজামাতার সামনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালো কর্মকার। কেন তাকে কৌতূহলী জনতার মধ্য থেকে ধরে আনা হয়েছে—কিছুতেই বুঝতে পারছিল না সে।

কর্মকারের সামনে এগিয়ে এলেন বিনয়াদিত্য। পাশে জনতা রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলে অপেক্ষা করছে। হয়তো আগে কি অপরাধ

করেছে কর্মকার। রাজ-রোষে পড়েছে হয়তো। রাজার জামাতা শাস্তি দিয়ে যাবেন কর্মকারকে।

সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে এগিয়ে এসে, শঙ্কর কর্মকারের দুই কাঁধে হাত রাখলেন জয়াপীড়। সহাস্যে তাকালেন তার দিকে।

—'আমাকে চিনতে পারলে না মিতা?'

নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না কর্মকার। বেশ কিছুক্ষণ মুখে কথা ফুটলো না তার। রাজসজ্জা আর রাজরথের জাঁক-জমকে তার চোখে ধাঁধা লেগে গেছে। সব কিছু ছাপিয়ে তার কুটিরের বিদেশী অতিথির মুখখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবার সেও স্তম্ভিত গলায় বলে ওঠে, 'বিদেশী মিতা!'

'আমার জন্য তোমার তরবারি প্রস্তুত করে রেখেছো তো, মিতা?' হাসি মুখে বললেন কাশ্মীরপতি। 'তা হলে শীঘ্র এনে দাও। আর, মিতানী আমার জন্য পিষ্টক করে নি?'

শঙ্করের পিছনে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবতীর গভীর কালো চোখের দৃষ্টি জয়াপীড় লক্ষ্য করলেন। সে চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত। তাই দেখে সকৌতুকে হাসলেন তিনি।

এদিকে কাশ্মীরপতির কথায় ত্রস্ত পায়ে কুটিরের দিকে ছুটলো কর্মকার। অনতিবিলম্বে একখানি তীক্ষ্ণফলা তরবারি এনে রাখলো বিনয়াদিত্যের পদতলে।

'পদতলে নয় বন্ধু, আমার হাতে তুলে দাও।' বলেই সস্নেহে কর্মকারের তরবারিখানি জয়াপীড় তুলে নিলেন নিজের হাতে।

'পিষ্টক বুঝি আর খাওয়া হলো না।' বলতে বলতে একটি স্বর্ণমুদ্রা ভরা থলি তুলে দিলেন কর্মকারের হাতে। 'তোমার কর্মশালাটি আরো বড় করো, মিতানীকে গা ভরা গহনা গড়িয়ে দিও—'

আবার রাজরথে উঠলেন বিনয়াদিত্য জয়াপীড়।

হর্ষধ্বনি করে উঠলো জনতা। শিবিকার আবরণ সরিয়ে দুই নারীও দেখছিলেন বিনয়াদিত্য আর শঙ্কর কর্মকারের মিলন দৃশ্য।

কাশ্মীরপতির মহানুভবতায় দুজনেরই মন গর্বে এবং আনন্দে ভরে উঠলো।

কিছুক্ষণের পর সেনাপতির আদেশে আবার অগ্রসর হলো বিনয়াদিত্যের বাহিনী।

ক্রমে বাহিনী এগিয়ে চললো কজঙ্গলের সীমা পার হয়ে, চম্পা থেকে পাটলিপুত্র অতিক্রম করে কান্যকুব্জের দিকে।

শক্তিশালী গৌড়সেনার সহায়তায় রাজা চক্রায়ুধকে যুদ্ধে হারিয়ে, কান্যকুব্জের উপরে কাশ্মীররাজের শাসন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করে, বিজয় বাহিনী নিয়ে বিনয়াদিত্য এগিয়ে চললেন আরও উত্তরে।

বিনয়াদিত্য জয়াপীড়ের বিজয় বাহিনী সেনাপতি দেবশর্মার অধীনে কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এ সংবাদ কাশ্মীরেও পৌঁছেছিল।

জজ্জও প্রস্তুত ছিল তার সেনাবাহিনী নিয়ে। কাশ্মীররাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে একটি গণ্ডগ্রাম পুষ্কলেত্র।

পুষ্কলেত্র গ্রামের—বিশাল প্রান্তরে, উভয় পক্ষের সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলো।

এবার বিজয়লক্ষ্মী বিনয়াদিত্যের উপর প্রসন্ন হলেন।

যুদ্ধ চলার সময় শ্রীদেব নামে এক রাজভক্ত চণ্ডাল নির্ভুল লক্ষ্যে তার ক্ষেপণী অস্ত্রের সাহায্যে প্রস্তর খণ্ড দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলো জজ্জকে। জজ্জ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ভূপাতিত হলো।

শীঘ্রই মৃত্যু হলো জজ্জের। জজ্জের সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো, যুদ্ধ শেষ হলো। বিজয়ী হলেন জয়াপীড়।

রাজ্য হারানোর তিন বৎসর পরে—আবার হৃতরাজ্য ফিরে পেলেন, কাশ্মীররাজ বিনয়াদিত্য জয়াপীড়।

গৌড়ের রাজকন্যা কল্যাণদেবী সত্যই ছিলেন তাঁর সৌভাগ্য-লক্ষ্মী। কল্যাণস্বরূপিনী।

স্বামীর বিজয় চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য, রাজশত্রু জজ্জ

যেখানে নিহত হয়, সেখানে রাজবধূ স্থাপন করলেন কল্যাণপুর নামে একটি জনপদ।

কোমলাঙ্গী, মধুরভাষিণী আর অনুরাগবতী এই পুণ্ড্রবর্ধন রাজকন্যার ব্যবহারে কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য এতো মুগ্ধ, এতো প্রীত হয়েছিলেন; যে তিনি স্বয়ং রাজবধূ কল্যাণদেবীর প্রতিহারীর পদ নিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন।

কল্যাণদেবীর পুত্রই সংগ্রামপীড় এবং পৃথিব্যাপীড় নাম নিয়ে পরে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন।

আর কমলা?

কমলা ছিল বিনয়াদিত্য জয়াপীড়ের চিরপ্রেয়সী। জয়াপীড় খুবই অনুরক্ত ছিলেন কমলার প্রতি। সুদূর কাশ্মীরে কমলাপুর নামেও একটি ক্ষুদ্র জনপদ গড়ে উঠেছিল পুণ্ড্রবর্ধনের দেবনর্তকীর নামে।

কাশ্মীরপতি বিনয়াদিত্য জয়াপীড়ের জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছিল দুই গৌড়কন্যার জীবন। একজন—রাজবালা, রাজবধূ। অন্য জন—অজ্ঞাতপরিচয় এক দেবনর্তকী।

জয়াপীড় দুজনের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন।

ইতিহাস তার সাক্ষী।